কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ডিসেম্বর ৮২

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন সুজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সীঃ লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

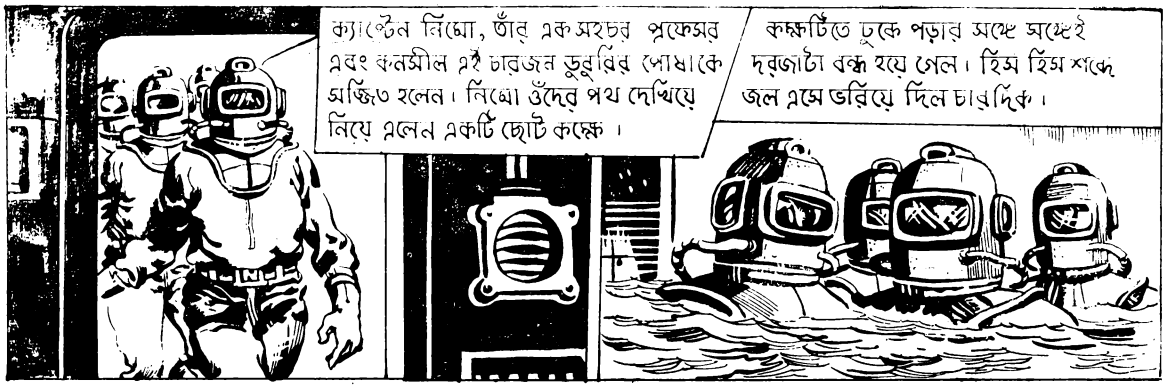

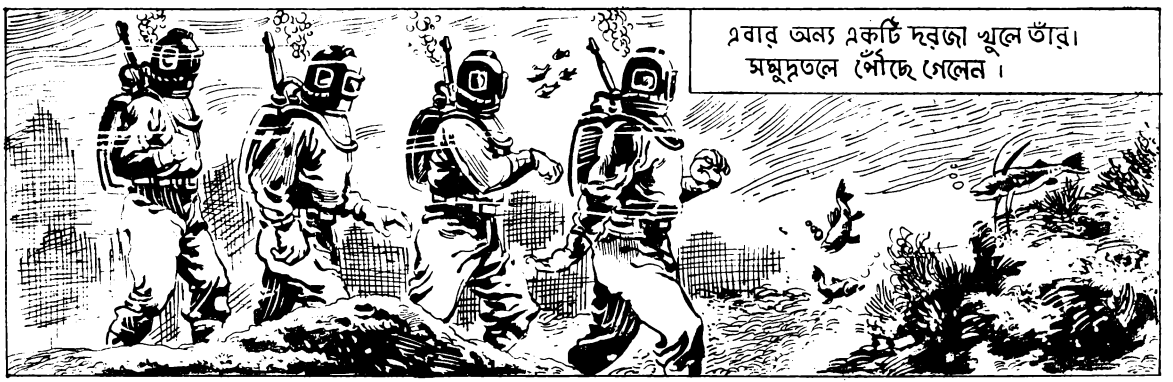

চিঠিপত্র

আমরা 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' সুন্দর পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠকবৃন্দ। আমরা গত জুলাই মাসের ড: তারকমোহন দাস কর্তৃক লিখিত জলের পরীক্ষাটি করতে গিয়ে কাঁচের পাত্রটি গরম করবার সময় সেটি ফেটে গেল। এখন আমরা কিরকমভাবে ঐ পরীক্ষাটি করব তা যদি বলে দেন তো খুব ভাল হয়।

সুশান্ত, সুকান্ত, দেবযানী, সুব্রত ও বিনয় চ্যাটার্জী।
7/39/6 বিজয়গড় কলিকাতা-32।

আমার রচনা আপনার ভাল লাগায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। অবশেষে জানাই যে "বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা কর" নামক রচনায় 2নং পয়েন্টের প্রথম লাইনে যে লেখা হয়েছে "একদিন···ঢালছে", ঐ লাইনে 'ঢালছের' পরিবর্তে "ফোটাচ্ছে" হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঐস্থানে মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আমি দুঃখিত। আমার লেখায় এইরকম সমালোচনা পুনরায় আশা করি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যুৎ মজুমদার, অকালপৌষ, বর্ধমান।

প্রসঙ্গ : রসায়নের সহজপাঠ : জুলাই, 1982

জুলাই 1982 সংখ্যায় রসায়নের সহজপাঠে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের রসায়নের সহকারী অধ্যাপক শ্রীপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। লেখক এজন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। নিচে ত্রুটিগুলি সংশোধন করে দেওয়া হলো।

পৃষ্ঠা 12—প্রোপাইল অ্যালকোহল—IUPAC নাম হবে 1-প্রোপানল।

ঐ—বিউটাইল অ্যালকোহল—IUPAC নাম হবে 1-বিউটানল।

ঐ—ডাই ইথাইল কিটোন—IUPAC নাম হবে 3-পেণ্টানোন।

পৃষ্ঠা 13—প্রোপাইল অ্যামিন—IUPAC নাম হবে 1-অ্যামিনো প্রোপেন।

ঐ—বিউটাইল অ্যামিন—IUPAC নাম হবে 1-অ্যামিনো বিউটেন।

ঐ—মিথাইল ইথাইল ইথার—IUPAC নাম হবে 3 মিথোক্সি ইথেন।

পৃষ্ঠা 15—(4)

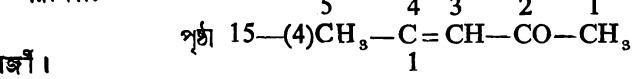

$$\overset{5}{CH_3}-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{4}{C}}=\overset{3}{CH}-\overset{2}{CO}-\overset{1}{CH_3}$$

গঠনযুক্ত যৌগটির IUPAC নাম হবে 4 মিথাইল পেণ্ট 3-ইন 2-অল।

ঐ—(5) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-বিউটিন।

ঐ—(6) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-বিউটেন।

ঐ—(7) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-মিথাইল প্রোপেন।

ঐ—(8) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2, 2, 3 ট্রাই ক্লোরো বিউটেন।

ঐ—(9) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 3-ক্লোরো 2-মিথাইল 2-বিউটিন I-অল।

ঐ—(11) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-মিথাইল বিউটেন।

ঐ—(12) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-মিথাইল প্রোপান 2-অল।

ঐ—(22) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 4 মিথাইল পেণ্ট 2-ইন।

ঐ—(24) নং যৌগটির IUPAC নাম হবে 2-মিথাইল বিউটাইন্যাল।

সপ্তম নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্পশিবির 1983

দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল-এর

পরিচালনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আগামী 22-24 জানুয়ারী '83

যোগাযোগ করতে হবে : 104 ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-700008

ক) **বিজ্ঞান পুস্তক ও পত্রিকা পুরস্কার :** বিভিন্ন প্রকাশক ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক নিজ নিজ পুস্তক ও পত্রিকা পুরস্কার মনোনয়নের জন্য পাঠাতে পারেন।

খ) **বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও মেধা পুরস্কার :** বিভিন্ন সায়েন্স ক্লাব, অথবা আগ্রহী তরুণ (22 বছরের মধ্যে) তাদের স্বয়ং তৈরী বিজ্ঞানের অভিনব প্রজেক্ট বা মডেল শিবিরে মনোনয়নের জন্য পাঠাতে পারেন।

গ) **পরিবেশ ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পুরস্কার :** নিজস্ব এলাকাভিত্তিক পরিবেশ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে যে সমস্ত সংস্থা উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন বা হাতে নিয়েছেন, তাঁরা সেই প্রজেক্ট-এর বিবরণ সহ আবেদন করুন 5 ডিসেম্বরের মধ্যে। ঘ) **বিজ্ঞান কুইজ, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা :**

বিজ্ঞান সংবাদ

চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন

পূর্বভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতির পরিচালনায় এবং নদীয়া জেলা সংযুক্ত বিজ্ঞান সমিতির ব্যবস্থাপনায় আগামী 28, 29 ও 30 ডিসেম্বর 82 কৃষ্ণনগরের বি বি সি টেকনিক্যাল কলেজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ক্লাবদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে তোলা, বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট, মডেল তৈরীর কাজে সহযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও অন্যান্য কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ, সর্বোপরি জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা; বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও যুক্তিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যের প্রত্যেকটি বিজ্ঞান ক্লাবকে এই সম্মেলন সফল করতে সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের থাকাখাওয়া ও রেজিস্ট্রেশন কি বাবদ দিতে হবে 15 টাকা (ছাত্রছাত্রীদের জন্য) এবং 20 টাকা (সাধারণের জন্য)। যোগাযোগঃ (1) দীপঙ্কর রায়, EISCA, 13 রিজেন্ট এস্টেট, কলিকাতা-700092; (২) সম্পাদক, নদীয়া জেলা সংযুক্ত বিজ্ঞান সমিতি প্রযত্নে বি পি সি জুনিয়ার টেকনিক্যাল হাইস্কুল। কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া।

নোবেল পুরস্কার—1982

এবছরে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আমেরিকার বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক কেনেথ উইলসনকে। অধ্যাপক উইলসন বর্তমানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। বিভিন্ন অবস্থায় বস্তুর পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক অ্যারন ক্লাগকে। অধ্যাপক ক্লাগ বর্তমানে কেমব্রিজে আণবিক জীববিজ্ঞানে গবেষণারত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন। অধ্যাপক জন আর ভেন. সুনে বার্গস্ট্রম এবং বি. স্যামুয়েলসন। অধ্যাপক ভেন বৃটেনের ওয়েলকাম রিসার্চ লেবরেটরীতে এবং বার্গস্ট্রয়েম ও সামুয়েলসন স্টকহোমের কারোলিনস্‌কো ইনস্টিটিউটে গবেষণারত।

দ্বাদশ জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ঃ

গত 10 নভেম্বর শিশুদের জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী আলিপুরের হেস্টিংসে হয়। প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। এই প্রদর্শনীতে কুড়িটি রাজ্যের চারশ ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ন্যাশনাল কাউনসিল অফ্‌ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং।

'বিজ্ঞান এষণা'র উদ্যোগে আলোচনা

ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে শিলিগুড়ির প্রান্তে একটি বিদ্যালয়ে (শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ), 'বিজ্ঞান এষণা' নামে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রসারে ক্লাব কতগুলো কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বিজ্ঞান পাঠবিভাগ ও গ্রন্থাগার, সায়েন্স নিউজ বুলেটিন, মডেল ও চার্ট তৈরী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। সম্প্রতি রাজগঞ্জ ব্লক যুবকরণ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক এক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'মহাকাশ ও মানবজাতি।' এতে বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ও ক্লাবের সভ্য কৌশিক দত্ত ও বিনয়ভূষণ ঘোষ অংশ নেয় এবং যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্রে বিনয় চতুর্থ ও কৌশিক ষষ্ঠস্থান অধিকার করে।

এই ক্লাব EISCA এর সদস্য। ব্যাপকতর বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে এই ক্লাব একীভূত হতে সচেষ্ট।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

2য় বর্ষ 9ম সংখ্যা ॥ 1982

ডিসেম্বর সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

তোমাদের অনেকেরই স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে বা শীঘ্র শুরু হবে। আশা করি, ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে সকলেই পরীক্ষা দিচ্ছ বা দেবে। আর যারা সামনের মার্চ মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তারা প্রস্তুত হচ্ছ স্কুলে টেস্ট পরীক্ষার জন্যে। শুনেছি কোন কোন স্কুলে ইতিমধ্যেই টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যে 'সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে, সেকথা তোমাদের আগেই জানিয়েছি।

খেলাধূলা জগতের অন্যতম রাজসূয় যজ্ঞ নবম এশিয়ান গেমস্ বা এশিয়াড—82' গত 19 নভেম্বর দিল্লীতে শুরু হয়েছে। এশিয়াড সম্পর্কে তোমরা সকলেই অল্পবিস্তর কৌতূহলী। তাই এশিয়াড সম্বন্ধে একটি লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। লেখাটি তোমাদের ভালো লাগবে নিশ্চয়।

বিজ্ঞানজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার এবছর যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের নাম ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। তাঁদের কর্মকৃতির পরিচয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

চিঠিপত্র : 1
বিজ্ঞান সংবাদ : 2
সম্পাদকীয় : 3

দপ্তর থেকে
ভৌতিক শব্দ : সমরজিৎ কর 4

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 40

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
অভিরাম : নিরঞ্জন সিংহ 9

পড়াশোনা
তন্তু আলোকবিজ্ঞান : অলোক চক্রবর্তী 17
নিষ্প্রাণ বায়ু নাইট্রোজেন : অমরনাথ রায় 33
সমীকরণ সমাধানের সহজ পদ্ধতি : নন্দলাল মাইতি 24
জীবন-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রশ্ন : তারকমোহন দাস 47

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
প্রকৃতিবিদ চার্লস রবার্ট ডারউইন : অশোককান্তি সান্যাল 22

পশুপাখীর গল্প
মাছরাঙা পাখীদের কথা : অজয় হোম 36

নিজে কর
মজার পরীক্ষা : তাপসকুমার রায় 50

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
এশিয়াড 1982 : মঞ্জিল সেন 14
মাংসাশী উদ্ভিদ : প্রদীপ ধর 20
ছায়াপথ : অনির্বাণ চক্রবর্তী 21
ঘড়িশিল্পের ক্রমবিকাশ : গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 6
গ্রহের রাজা বৃহস্পতি : বিমান বসু 27
1-এর মজা : সজল চক্রবর্তী 19

বিজ্ঞানের ভেলকি
লজিকের খেলা-L : সিদ্ধার্থ ঘোষ 44
রহস্যময় নিরুদ্দেশের রহস্যভেদ : সিদ্ধার্থ ঘোষ 45

ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস 16
টোয়েণ্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী : প্রচ্ছদ 2, 3
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস 21
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল 56
ছবির মজা : প্রণব হোড় 46

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা উত্তরদাতাদের নাম 49
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর 49 ॥ প্রশ্ন-উত্তর 50
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা 53
সাতটা বেজে এগারো : তথাগত চট্টোপাধ্যায় 51
আই-কিউ পরীক্ষা : দেবাশিস কর 55

দপ্তর থেকে

ভৌতিক শব্দ

সমরজিৎ কর

1960। শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে উড়তে পারে সেই যে কনকর্ড প্লেন, তারই ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারে পুরোদস্তুর পরীক্ষা চলছে ব্রিস্টলে। কাছেই মস্ত একটি বাড়ি। সেই বাড়ির একটি ঘরে কয়েকজন কারিগরি নকসা আঁকিয়ে (ড্রাফটস্‌ম্যান্‌) কাজ করেন। ইঞ্জিনের বজ্রের মত গর্জন তাঁদের যাতে না বিরক্তি ঘটায় সে দিকে চোখ রেখেই ঘরটি তৈরী হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় ঘরটি ছিল শব্দরোধী (sound proof)। কোন শব্দ তার ভেতরে ঢোকার কথা নয়।

আশ্চর্য! ওই ঘরে কাজ করতে গিয়ে কয়েক দিন পর নানারকম অভিযোগ তুললেন আঁকিয়েরা। কেউ বললেন, তাঁদের বুক ধড়ফড় করে। কেউ বললেন, মনে হয় এই বুঝি কেউ গলা টিপে ধরলো। চোখ ঝাপসা হচ্ছে, কণ্ঠস্বরে আড়ষ্টভাব। কেউ বা হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ওঠেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! অমন শব্দহীন ঘর, অমন সুন্দর ব্যবস্থা, অথচ এসবের মানে কি?

প্রমাদ গুণলেন বিশেষজ্ঞরা। নানাভাবে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলেন। কিন্তু কারণই ধরতে পারলেন না তাঁরা। তবে হ্যাঁ, একটা ঘটনা তাঁদের চোখে পড়ল। তাঁরা দেখলেন, ঘরের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আঁকিয়েরা যে সব সময় অসুস্থ বোধ করেন তা নয়। ব্যাপারগুলি ঘটে ঠিক সেই সময় যখন কনকর্ডের ইঞ্জিন নিয়ে চলে পরীক্ষা।

শব্দ? তা হলে ইঞ্জিনের শব্দের দরুনই কি ভোগান্তি ঘটছে আঁকিয়েদের। ভাবলেন বিশেষজ্ঞরা।

কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব? ওই ঘরে বাইরের কোন শব্দই তো শোনাও যায় না।

চললো অনুসন্ধান। আর—ভৌতিক ব্যাপারই বলবো। অসুস্থতার কারণ শব্দই। তবে স'ধারণ শব্দ বলতে আমরা যা বুঝি তেমন শব্দ নয়। সে শব্দের কম্পাঙ্ক পরে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, আঁকিয়েদের কম্পাঙ্কের অনেক কম। মাত্র 1 হার্টজ। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ওই শব্দের মাত্রা ঘরের সব জায়গায় একরকম নয়। কোথাও কম, কোথাও বেশি। পরে জানা গেল কনকর্ডের ইঞ্জিনই ওই শব্দের উৎস। বলে রাখি হার্টজ (Hertz) হল তরঙ্গের কম্পাঙ্কের একক। তরঙ্গ যখন এক সেকেণ্ডে একটি পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ সম্পন্ন করে তখন তার কম্পাঙ্কের মাত্রাকে বলা হয় এক হার্টজ।

যা বললাম। ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন পরেই বোঝা গিয়েছিল। কারণ যে সময় এই ঘটনা ধরা পড়ে তখন হার্টজের নিচের কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ মাপা এবং গবেষণার মত উপযুক্ত এবং সংবেদনশীল যন্ত্রই তৈরি হয় নি। এখানে বলে রাখি, 20 হার্টজের নিচের কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় 'Infra sound'। বাংলায় বলতে পারো 'অবস্পন্দন শব্দ।'

যাই হোক ব্রিস্টলের ওই আঁকিয়েদের কথা ভেবে লিভারপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী, নাম অধ্যাপক ডেরিক পারবুক, রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিলেন। উদ্দেশ্য, 50 হার্টজের নিচের কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ মানুষের উপর কি প্রতিক্রিয়া করে সেটা জানা।

বলতে কি, অত কম কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষের পক্ষে কতটা সহ্য করা সম্ভব এর আগে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের তেমন কোন ধারণাই ছিল না। পৃথিবীর সব দেশের পাঠ্য-পুস্তকে এত দিন লেখা হচ্ছিল, শব্দের কম্পাঙ্ক 20 থেকে 20000 হার্টজের মধ্যে থাকলে তবেই সম্ভব সেই শব্দ মানুষের পক্ষে শোনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কথাটা ঠিক নয়। কিছুদিন পর নরম্যান ইয়ো-ভারট্‌ নামে আর একজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন, 20

সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনিরোধী একটি ঘরে তীব্রতম শব্দ মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, জনৈক গবেষক নিজের উপর সেটা পরীক্ষা করে দেখছেন।

হার্টজ নয়, এর চেয়েও কম কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষ অনুভব করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাত্রা 1.5 হার্টজ। কম্পাঙ্ক যত বেশি হয় স্বরের তীক্ষ্ণতা তত বাড়ে।

শব্দের আর একটি ধর্ম হলো 'তীব্রতা' বিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে বোঝায়, প্রতি সেকেণ্ডে এক বর্গ সেনটি-মিটার তলের উপর যতটা শব্দশক্তি এসে আপতিত হয় তার পরিমাণকেই বলা হয় তীব্রতা। তীব্রতার উপরই নির্ভর করে—কোন্ শব্দ মৃদু, কোন্ শব্দ কানে তালা লাগানোর মত জোরালো। শব্দের এই ধর্মটি মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম 'বেল'। মোটা-মুটিভাবে 1 বেলের 10 ভাগের 1 ভাগকে বলা হয় 'ডেসিবেল'। সাধারণভাবে ব্যাপারটা এইভাবে বলি। তোমরা যখন ফিসফিসিয়ে কথা বল, তখন যে আওয়াজ (তীব্রতা) হয় তার পরিমাণ 20 ডেসিবলের মত। উঁচু পর্দায় কথা বল, তখন তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 60 ডেসিবেল। জোরে রেডিও চালালে 80 ডেসিবেল।

কিন্তু খুব মুশকিল কি জানো? অতিরিক্ত কম্পাঙ্কের জোরালো শব্দ নিয়ে পরীক্ষা চালানো সহজ। শব্দের কম্পাঙ্ক 1_0 হার্টজের কম হলেই যত গোলমাল। গোড়ায় অত কম কম্পাঙ্কের শব্দ মাপার মত যন্ত্রই ছিল না।

যাই হোক, এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করলেন নোবেল বিজ্ঞানী জর্জ ফন বেজিন। অনেক আগেই তিনি অবশ্য 'অবকম্পন' বিশিষ্ট শব্দ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। সেটা 1936। ওই সময় তিনি দুটি যন্ত্র তৈরি করেন। 'পিস্টোফোন' এবং 'থার্মোফোন'। এই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে তিনি 1 হার্টজ কম্পাঙ্কের শব্দ নিয়ে পরীক্ষা চালান। পিস্টোফোনে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিনি ওই ধরনের 'অবস্পন্দন' সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। আর থার্মোফোনের সাহায্যেও তৈরি করেন ওই শব্দ। 1967 সালে বেজিনের পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণায় হাত দিলেন নরম্যান ইরোভারট্ এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, শব্দের কম্পনাঙ্ক 15 থেকে 13 হার্টজের মধ্যে থাকলে শব্দ তার ধারা-বাহিকতা, স্পষ্টতা এবং ছন্দ হারিয়ে ফেলে। মনে হয়, এই বুঝি কম্পাঙ্ক বাড়লো, কিংবা কমলো। ইংরেজিতে বলা হয় 'ফিউশন ইফেক্ট অন্ ভিশন'-এর মতো। আলোর উৎস অস্থির হলে যেমন তা কখনও পর্যায়ক্রমে জোরালো এবং কমজোর বলে মনে হয়, ব্যাপারটা কতকটা সেইরকম। ওই শব্দ কখনও বাড়ে, কখনও কমে। অস্থির আলো যেমন 'স্পষ্ট-অস্পষ্টতার' কানামাছি খেলে আমাদের চোখে, ঠিক তেমনি 15 থেকে 18 হার্টজ কম্পনবিশিষ্ট শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঘটায় স্পষ্ট-অস্পষ্টতার অনুভূতি। তখন মনে হয়, কানে যেন খই ফুটছে। কম্পাঙ্কের মাত্রা 5 হার্টজের নিচে নামলে মাথাটা কেমন যেন ভন ভন করতে থাকে।

আর বিপদ বাড়ে তখন, যখন কম্পাঙ্ক হয় কম, অথচ তীব্রতা বেশি।

দেখা গেছে, শব্দের কম্পনাঙ্ক 50 হার্টজ রেখে তার তীব্রতা যদি 150 থেকে 155 ডেসিবলে তোলা যায় তা হলে মানুষের মাথা ধরে প্রচণ্ড। 66 থেকে 73 কম্পাঙ্কের শব্দে মনে হয় মাথা ঝিম ঝিম করছে, কোন কিছু গিলে খেতে কষ্ট হচ্ছে। 100 হার্টজে বমি বমি ভাব, মাথা ঝিম ঝিম এবং হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠা। 1968 সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডাদিমির গাভরু পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, 165 কম্পাঙ্কের শব্দ 160 ডেসিবলে তীব্রতায় রয়েছে এমন পরিবেশে কেউ যদি থাকে তা হলে দেখা যাবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। তবে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। পরিবেশ আমাদের কাছে থাকতে পারে সেখানে অবস্পন্দন শব্দ থাকা সম্ভব?

নিশ্চয় আছে। যেমন ধরো, মোটর গাড়ি যখন ঘণ্টায় 60 মাইল বেগে ছোটে তখন তা থেকে সৃষ্টি হয় অবস্পন্দন শব্দ। এই শব্দের কম্পাঙ্ক 16 হার্টজ, তীব্রতা 112 ডেসিবলের মত। দুই আসন বিশিষ্ট হেলিকপটার থেকে বের হয় 11·5 কম্পাঙ্কের শব্দ। তীব্রতা 118 ডেসিবেল। ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে বের হয় 7 হার্টজের শব্দ, তীব্রতা 115 ডেসিবেল।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, 105 ডেসিবেল তীব্রতা এবং 2 থেকে 15 হার্টজের শব্দ মানুষের দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটায়। 95 ডেসিবলে আশপাশের সব কিছু চিনতে কষ্ট হয়, রেলগাড়ি, ট্রাক, ট্রাকটর, রোলিং মিল—এমন অনেক কিছুই অবস্পন্দন' শব্দেব উৎস। এই শব্দের দরুন অনেক সময় মোটর গাড়ির চালকের দৃষ্টি ভ্রম ঘটে, ঘটে মানসিক অস্থিরতা। অনেকে মনে করেন মোটর দুর্ঘনার এটাও একটি কারণ। মোটর গাড়ির চালকরা অনেক সময় অভিযোগ করেন, দীর্ঘ পথযাত্রার পর তাঁরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। মনে হয়, সারা শরীরটা যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, চোখে ঝাপসা ঠেকছে। মোটর গাড়িতে চলার সময় কারো গা গুলিয়ে ওঠে। এর পেছনেও কাজ করে অবস্পন্দন শব্দ।

ভূতুড়ে এই শব্দ নিয়ে এখনও গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ভবিষাতে তাঁদের গবেষণা অবস্পন্দন শব্দ সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক নতুন কথা শোনাতে পারবে।

ঘড়িশিল্পের ক্রমবিকাশ

গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছোট বড় আমরা সবাই সময় মেপে কাজ করি। খেলাধূলা, সভাসমিতি, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, পূজা-অর্চনা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো পর্যন্ত ছোট-বড় বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সময়ের অতি সূক্ষ্ম হিসাব। এর তাৎপর্য যত বেড়েছে সময় মাপা যন্ত্রের তত উন্নতি ঘটেছে।

সেই ইতিহাস এখন বলবো।

সময় মাপা এবং সময়কে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার প্রথম প্রচেষ্টার কথা শোনা যায় চার হাজার বছর আগে। এ ব্যাপারে মিশরীয়দের পদ্ধতিকে প্রাচীনতম বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কোন ছায়ার দিকের (direction) যদি সঠিক পরিমাপ করা যায় তবে সমানভাগে বিভক্ত কৌণিক স্কেল পাওয়া সম্ভব—যে প্রক্রিয়ার ব্যবহার বিভিন্ন রকম সূর্য-ঘড়িতে দেখা যায়।

সময় মাপার যন্ত্র হিসাবে সূর্য-ঘড়ির স্থান সবার আগে হলেও, একে ঠিক ঘড়ি বলা যায় না।

ঘড়ি কথাটিকে ব্যবহার করতে হলে জল-ঘড়ির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়—খৃঃ পূঃ 1400তে মিশরীয়রা যা আবিষ্কার করেছিলেন। মিশরীয় জল-ঘড়িতে থাকত একটি ফুলদানী – যার নিচেতে ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে জলের ধারা আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে যেত। পাত্রটির ভিতরের দিকে দাগ কেটে ঘণ্টা মাপবার জন্য একটি স্কেল তৈরী করা হত। এছাড়া মাস বোঝাবার জন্য থাকত আর একটি স্কেল।

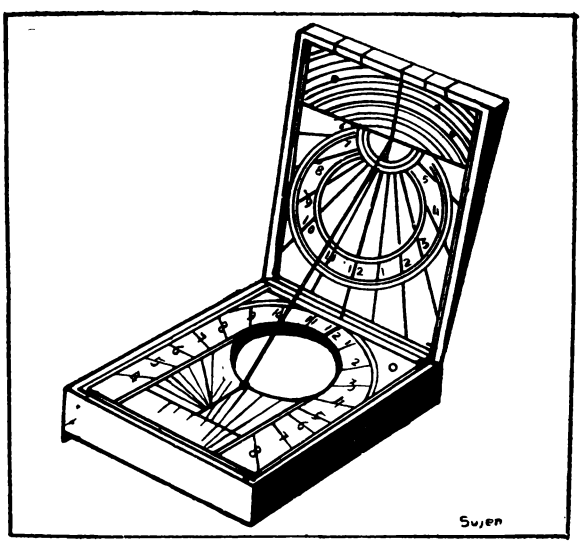

ষোড়শ শতকে ব্যবহৃত সূর্য ঘড়ি

রাত্রিতে মন্দিরে সময় বোঝাতে জল-ঘড়িকে ব্যবহার করা হত। একদল পুরোহিত যখন অপর একদলকে দায়িত্বভার দিয়ে যেতেন তখন এই জল-ঘড়ি দেখে তাঁরা সময় ঠিক করতেন। পাত্রের আকার এবং জলের গতি এবং চাপের বিভিন্নতার (যেমন গভীরতার উপর জলের চাপ নির্ভর করে) জন্য সময়কে সমানভাগে ভাগ করার পদ্ধতিটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। রাত্রির প্রথম দিকের কয়েক ঘণ্টাকে মনে হত অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ, শেষ দিকের ঘণ্টাগুলি তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। ফলে প্রথম দিকের পুরোহিতদের মন্দিরে দীর্ঘ-ক্ষণ থাকতে হত, শেষের দিকে যাঁরা আসতেন তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যেতেন।

জলঘড়ির পর দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রথম যন্ত্রচালিত ঘড়ির জন্য। প্রথম তৈরি হলো পোপ সিলভেসটারের জন্য খৃঃ পূঃ 900তে। ব্রিটেনের ক্যাণ্টারবরী ক্যাথেড্রালে টাঙানো হলো খৃঃ পূঃ 1212তে, সালিশবরীতে যন্ত্রচালিত প্রাচীনতম ঘড়িটি এসেছিল খৃঃ পূঃ 1386তে। ওয়েলেসের ঘড়িটির জন্মকাল খৃঃ পূঃ 1380তে, সাউথ কেনসিঙ্‌টনের সায়েন্স মিউজিয়ামে এটিকে রাখা হয়েছে।

এতক্ষণ যা বললাম সবই কিন্তু ঝোলানো ঘড়ি বা বড় ঘড়ি বা দেওয়াল ঘড়ির কথা, ইংরেজিতে যাকে ক্লক (clock) বলা হয়।

এখন বলছি টেঁক ঘড়ি, পকেট ঘড়ি বা ছোট ঘড়ির কথা, ইংরেজিতে যার নাম ওয়াচ্ (watch)।

খৃঃ পূঃ 1500তে এই ধরনের ঘড়িটিকে প্রথম দেখা গিয়েছিল। পিটার হেলিলিন নামে এক নুরেমবারগ-বাসীকে এই ধরনের ঘড়ির আবিষ্কর্তা বলে ধরা হয়। হেলিলিনের তৈরি ঘড়িগুলিকে বলা হতো 'নুরেমবারগ এগস' (Nuremberg eggs)। এগুলিকে কিন্তু ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার না করে গহনা হিসাবে বেশি ব্যবহার করা হত। সময় মাপার কাজে সহজভাবে ঘড়িগুলিকে যাতে ব্যবহারোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে অনেকে যত্নবান হলেও টমাস টমপিয়নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ঘড়িনির্মাণ বিষয়ে টমপিয়নের বিরাট অবদান।

ষোড়শ শতকে হেলিলিনের চেষ্টার পর ঘড়িশিল্পের

দ্রুত প্রসার ঘটলো—ক্রশ, বই, জীবজন্তু প্রভৃতির আকারে নির্মাণ করে ঘড়িগুলির গায়ে ঐ শতকের বিভিন্ন শিল্প-কলা খোদাই করা হত। রানী মেরীর ঘড়িটির ছিল করোটির আকার, রানী এলিজাবেথ পছন্দ করতেন মণি-মুক্তোখচিত ঘড়ির বাক্স।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে জাহাজের দুলুনি, প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি-আর্দ্র আবহাওয়া, বিভিন্ন রকম তাপমাত্রা এবং লবণাক্ত বাতাসের সংস্পর্শ প্রভৃতি সহ্য করতে পারবে এমন ঘড়ির প্রয়োজনের গুরুত্ব ভেবে বিভিন্ন সরকার ঘড়িশিল্পের ব্যাপক উন্নতিতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। তাঁদের এই বৃহত্তর প্রচেষ্টা 'ক্লক' এবং 'ওয়াচ' উভয় রকম ঘড়ির ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলো।

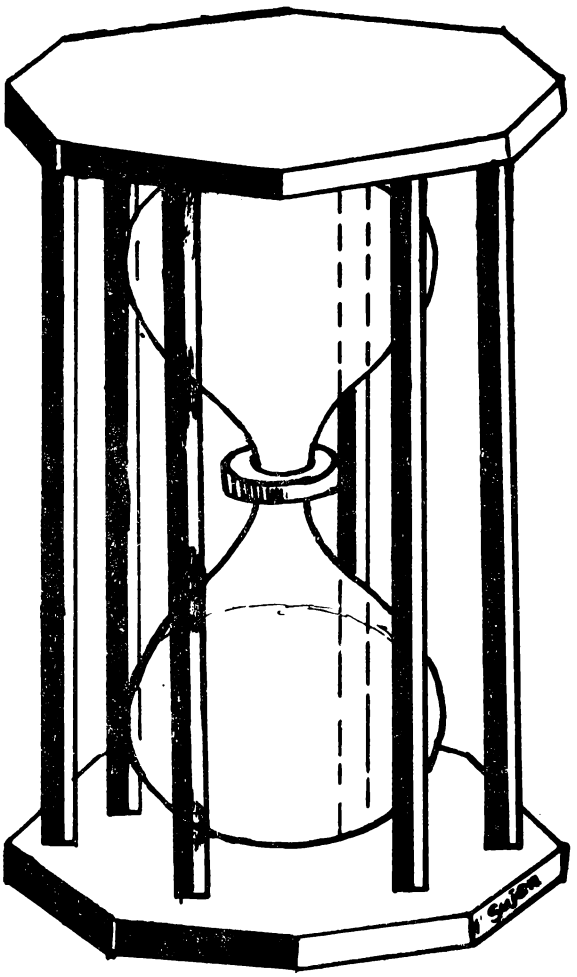

সপ্তদশ শতকে ব্যবহৃত সময়মাপক যন্ত্র

তৈরী হলো ক্রনোমিটার—সময়মাপক যন্ত্র হিসাবে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে যা স্বীকৃতি পেয়েছিল আজও তা বিদ্যুৎনিরপেক্ষ শকপ্রুফ (Insulated and shock proof) ঘড়ি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত।

ঘড়ির নির্মাণকৌশলে মণি এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবহার শুরু হয় সতেরশো শতকের গোড়ার দিকে। হীরে, চুনি এবং নীলকান্তমণির ব্যবহার বেশি জনপ্রিয় ছিল। অল্প খরচে কৃত্রিম চুনি এবং নীলকান্তমণির উৎপাদন বর্তমানে সম্ভব হওয়ায় ঘড়িতে এগুলির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

1670 সালের আগে কিন্তু মিনিটের কাঁটার ব্যবহার ছিল না, ঘড়িগুলিতে শুধু ঘণ্টার কাঁটা থাকত।

মিনিটের কাঁটা আছে এরকম ঘড়িকে সাধারণের সামনে প্রথম দেখা গিয়েছিল সেণ্ট ডানস্টান গির্জায়। 1670-71 সালে এটিকে নির্মাণ করেছিলেন যিনি তাঁর নাম টমাস হ্যারী। এককাঁটা যুক্ত ঘড়িকে অবশ্য এর আগে দেখা যেত। বাকিংহামসায়রে কলনব্রুক গির্জায় এক কাঁটাযুক্ত যে ঘড়িটি আছে তার নির্মাণকাল ছিল 1746 সাল। 1877-78 সালে যিনি এর সংস্কার করেন তাঁর নাম 'হল'। ঘড়ি নির্মাণকার্যে দক্ষ এক পরিবারে হলের জন্ম হয়। ঘড়ি নির্মাণের কাজকে মধ্যযুগে পৃথক শিল্প বলে মনে করা হত না, এটা কর্মকারদের কাজ বলে মনে করা হত। হল যে পরিবারে জন্মেছিলেন সেখানে বিখ্যাত কয়েকজন কর্মকারের নাম শোনা যায়, যাঁরা রাজ-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

1676 সালে ডঃ হুক কর্তৃক দীর্ঘ দোলন আবিষ্কারের আগে দেওয়াল ঘড়িগুলিতে থাকত ছোট দোলনপিণ্ড এবং ঝোলানো ওজন। দোলন এবং ঘড়ির অন্যান্য যন্ত্র-পাতিকে ঢেকে রাখতে ঘড়ি আধারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 1680 থেকে 1720 সালের মধ্যে। এই প্রচেষ্টা থেকে সৃষ্টি হলো লম্বা লম্বা আধারযুক্ত দেওয়াল ঘড়ি।

এই সময় যে দেওয়াল ঘড়িগুলিকে ব্যবহার করা হত তাদের উচ্চতা ছিল 6 ফুট 6 ইঞ্চি। এই ধরনের ঘড়ির ক্ষেত্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন এডওয়ার্ড ইস্ট, লণ্ডনের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন তিনি এই ব্যাপারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। চার্লস-1 এবং চার্লস-2 উভয়ের রাজত্বকালে পাওয়া বহু দেওয়াল ঘড়িতে তাঁর স্বাক্ষর এবং তারিখ চোখে পড়ে।

1760-1800 সালে ঘড়িশিল্পের ইতিহাসে আবার এক নতুন যুগ এলো।

ঘড়ির ডায়ালে রঙ-ছবি এবং মীনের (enamel)

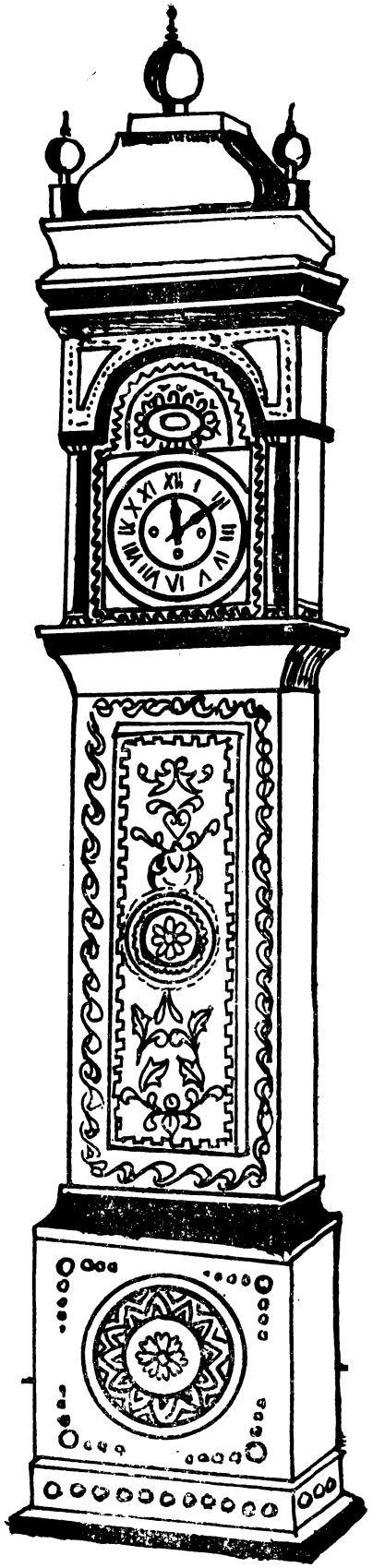

ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রাখা ঘড়ি

Sujen

চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বিচিত্র রকমের ডায়াল এবং ঘড়ি-আধার দেখা গেল। এইরকম ছবি সংবলিত ডায়ালের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ, সপ্তাহের 7টি দিন এবং রাশিচক্র সমেতডায়ালযুক্ত ঘড়িগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

রানী ভিক্টোরিয়ার ঘড়িটির মুখটি ছিল সাদা মীনে করা, একটি উত্তল কাঁচ বিশিষ্ট আধারটি ছিল আবলুস কাঠের। রানীর প্রত্যেকটি ঘরে এই একই ধরনের ঘড়ি থাকত। ঘরের যেখানেই তিনি থাকুন না, ঘড়ির দিকে তাকালেই নির্দিষ্ট সময়টি জানতে পারতেন। অত্যন্ত পরিষ্কার ডায়াল এবং উত্তল কাঁচটির জন্য এটি সম্ভব হত।

নির্ভুল ঘড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখ-যোগ্য তাঁদের মধ্যে ডঃ এল, কোমরাই. জর্জ মারগারেট, জর্জ এয়ারের নাম না করলেই নয়।

ঘড়ির ইতিহাসে কিছু অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চার্য কাহিনী জড়িয়ে আছে এরকম কয়েকটা ঘড়ির উল্লেখ করছি।

বছর চল্লিশেক আগে লণ্ডনের একটি খবরের কাগজে একটি ঘড়িকে ঘিরে যে কাহিনী লেখা হয়েছিল: (লেখকের উক্তি)

'অনেক দিনের পুরোনো আমাদের একটি ঘড়ি আছে যেটি বংশপরম্পরায় নির্ভুল সময় দিয়ে আসছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘড়িটি আমাদের পরিবারের জন্ম মৃত্যু, শুভ-অশুভ প্রভৃতি ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকে আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে।

দিনের চতুর্থ প্রহরে কিংবা ঢং ঢং..... এইভাবে দিনের চতুর্থ ঘণ্টা ঘোষণার সময় আমাদের পরিবারের বড়ভাই সেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেতেন—তিনি যদি বাড়ি থেকে বহু দূরে কোথাও থাকতেন তবুও সেই আওয়াজ তাঁর কানে যেত। বংশপরম্পরায় এ ঘটনা ঘটে আসছে।

চারটির পরিবর্তে যদি অন্য কোন সংখ্যা ঢং ঢং... করে বাজত তবে সেই আওয়াজের ধরন দেখে আমরা বুঝতে পারতাম ঐ নির্দিষ্ট দিন পরে কি ঘটতে যাচ্ছে।

আওয়াজটি যখন মৃদু শোনাত আমরা বুঝতাম পরিবারে কেউ মারা যাবে, জোরে আওয়াজ হলে নব-জাতকের কথা বোঝাত। আর ভাঙা ঘণ্টার মত আওয়াজ হলে বুঝতাম আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে অশুভ কোন কিছু ঘটবার আগে। তবে সবক্ষেত্রেই ঘটনাটি ঘটতো ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে।'

ইলেকট্রনিকসের ব্যাপক চর্চার ফলে বর্তমানে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ঘড়িশিল্পেও দ্রুততর অগ্রগতি ঘটেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ভুল সময়ের জন্যে এখন আর সপ্তাহব্যাপী অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। 'ম্যাজিক চোখের' কল্যাণে মুহূর্তমধ্যে ঘড়ির ত্রুটি ধরা পড়ছে।

সেদিনের আর দেরী নেই, যখন খুব সস্তা ঘড়ি থেকেও নির্ভুল সময় পাওয়া সম্ভব হবে।

বাণীপুর পি. জি. বি. টি. কলেজ

নিরঞ্জন সিংহ

বেলা দশটা নাগাদ ছোটমামার ওখানে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার নাম করতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি উড়িষ্যার উপকূলের একটি নির্জন জায়গা। ওসানো-গ্রাফিক ইনসটিটুটের একটি পরীক্ষাগার আছে ওখানে। ছোটমামা সেখানেই কাজ করেন। উনি নামকরা সার্জেন। সমুদ্রগবেষণাগারে উনি কি ধরনের গবেষণ্য কাজের সঙ্গে জড়িত তা অবশ্য জানতাম না। পুজোর আগে উনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, 'জয়, পুজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ হলেই আমার ওখানে চলে আসিস্। তোকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবো।' ছুটিতে বেড়ানোর এমন সুযোগ হাত ছাড়া করলাম না। বাবা-মাকে বলতেই অনুমতি মিলে গেল।

ইনসটিট্যুটের বিরাট দোতলাবাড়ি আর বেশ কয়েকটা কোয়ার্টার্স ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। লোকালয় বহু-দূরে। কাছে পিঠে যে শহরটি তার দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার। সামনে নীল সমুদ্র। সমুদ্র থেকে একটা ছোট খাড়ি ঢুকে এসেছে ভিতরে। পাশে ছোট্ট একটা জেটি। একটা ছোট্ট মাছধরা ট্রলার নোঙর করা আছে।

ছোটমামা ব্যাচেলার মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ইনসটিট্যুটের ক্যান্টিনে। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'চট করে চানটা সেরে নে। ক্যান্টিনে নিয়ে যাব। খাওয়াদাওয়া শেষ করে এসে ঘুম লাগা। বিকেলে ফিরে কথাবার্তা হবে।' তাই হল। খাওয়াদাওয়া সেরে কোয়ার্টার্সে ফিরে এলাম। সারারাত ট্রেন জার্নিং, স্নান খাওয়া শেষ হতেই দুচোখ জুড়ে এল ঘুমে। ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় দুটো বাজে। বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জন আর হাওয়া। ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করলো না। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এগিয়ে গেলাম সমুদ্রের দিকে। ইনসটিট্যুটের ডানদিকে একটা ঝাউবন। আমি ওইদিকে এগিয়ে চললাম। হু হু করে হাওয়া বইছে। সমুদ্র অবশ্য আগে দেখেছি। পুরীতে, খুব ছোটবেলায়। নুলিয়ার হাত ধরে স্নানও করেছি। কিন্তু সে স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়। ধূ ধূ সমুদ্র। লম্বা লম্বা ঢেউগুলো সাদা ফেনার মুকুট মাথায় পরে গড়িয়ে গড়িয়ে কূলে এসে আছড়ে পড়ছে।

ঝাউবনের ছায়ায় বসে সমুদ্রের এই ঢেউভাঙার খেলা দেখছিলাম। সমুদ্রের পাড়ের কাছে কটা শঙ্খচিল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, ঢেউ-এর মাথার উপর কী যেন একটা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই ওটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম! উঠে সমুদ্রের ধারে ছুটে গেলাম। ততক্ষণে কূলে এসে তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো একটা 12/13 বছরের ছেলে। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত পলিথিনের একটা মুখোশপরা। চোখের উপরে স্বচ্ছ চশমার মত বড় বড় দুটো কাচের ঠুলি লাগানো। মুখের কাছে একটা ফুটো। খালি গা। পরনে একটা পলিথিনের জাঙিয়া। জল থেকে উঠে সন্ত্রস্তভাবে একবার এদিক ওদিক দেখে নিল, অর্থাৎ ধারে কাছে কেউ আছে কিনা। তারপর সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না এইটুকু ছেলে ওইরকম অদ্ভুত পোষাক পরে একা একা সমুদ্রের মধ্যে কি করছিল? ছেলেটি যে কোন নুলিয়া বা জেলের ছেলে নয় তা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আর ধারে কাছে কোন নুলিয়া বা জেলের বাস নেই বলেই আমার বিশ্বাস। নিশ্চয় ও তা হলে ইনস্টিট্যুটেরই কোন কর্মচারীর ছেলে। ও যে দারুন দুঃসাহসী তাতে আমার কোন সন্দেহই রইলো না। ওর সম্পূর্ণ মুখটা দেখতে না পেলেও ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে ওর চোখেমুখে আশ্চর্য কৌতূহল।

আমিই প্রথমে কথা বললাম, 'তোমার নাম কি?'

'অভিরাম।' চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে জবাব দিল ও।

'একা একা সমুদ্রে নেমেছ, তোমার ভয় করে না?'

ও ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ ভয়ে করে না।

'কোথায় থাকো তুমি?'

ও ঘুরে হাত বাড়িয়ে সমুদ্র দেখালো।

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। বলে কি ছেলেটা? পাগলটাগল নাকি?

ভাবলাম ছেলেটা আমার সঙ্গে নিশ্চয় মজা করছে। তাই আমিও একটু হেসে বললাম, 'সমুদ্রের নিচে তোমার বাড়ি, সেখানেই থাকো বুঝি? রাতে ঘুমোও কোথায়, সমুদ্রের নিচের বাড়িতে?'

অভিরাম এবার জোরে মাথা নেড়ে বোধহয় আমার কথার প্রতিবাদ জানালো। তারপর ইনস্টিট্যুটিটের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে শুই। তা ছাড়া সমুদ্রে থাকি।'

আমি ওর কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলাম। গলাটা কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে, ঠিক স্বাভাবিক নয়। মনে হল অতিরিক্ত জলে ভিজে ভিজে ওর গলার অবস্থা ওরকম হয়েছে। ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না আমি। ভাবলাম ছেলেটা আমাকে নতুন দেখে মজা করছে। সারাদিন কেউ সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে বেড়াতে পারে?

অভিরাম একবার মুখোশটা খুলতে গিয়েও কি ভেবে যেন খুললো না। মুখটা নিচু করে কয়েক মিনিট কি যেন চিন্তা করলো, তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে আবার সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগলো।

আমি একটু চেঁচিয়ে বললাম, 'অভিরাম, অনেক বেলা হয়েছে, আর সমুদ্রের নেম না। বাড়ি ফিরে যাও।'

অভিরাম একবার ঘুরে আমার দিকে তাকালো, তারপর হঠাৎই ছুটতে শুরু করলো। ছেলেটার মতিগতি কিছুই আমার বোধগম্য হল না। তবে এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ছেলেটা স্বাভাবিক নয়। আমার কেমন যেন জিদ চেপে গেল। অভিরামকে ধরব বলে আমিও বালির

উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। বালির উপর দিয়ে দৌড়োনো সহজ কাজ নয়। আমি ওকে ধরে ফেলার আগেই অভিরাম সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, একি অদ্ভুত ছেলের পাল্লায় পড়লাম! সাহায্যের জন্যে আসেপাশে তাকালাম, কারণ আমি সাঁতার জানি না। নির্জন সৈকত। আমি বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শিষের শব্দ কানে ভেসে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। অভিরাম কূল থেকে বহুদূর চলে গেছে এবং ওখান থেকে আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ছে। আমি হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বললাম, 'অভিরাম ফিরে এসো।' কিন্তু সে ডাক ওর কানে পৌঁছুলো বলে মনে হল না। ও আরো দূরে এগিয়ে চলেছে। ও যে যেখানে পৌঁছেছে সেখানে সমুদ্র অনেকটা শান্ত, পাড়ের মত ঢেউ-এর মাতামাতি নেই। ওকে আর স্পষ্ট দেখা না। ওর দেহটা একটা ছোট্ট কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। এক সময় সে বিন্দুটাও যেন হঠাৎই অদৃশ্য হল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে ছেলেটা সমুদ্রে তলিয়ে গেল নাকি?

আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম ছোটমামার উদ্দেশ্যে। ওঁকে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগলো। আমাকে ওরকম হতদন্ত হয়ে পৌঁছুতে দেখে ছোটমামা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি? তোকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন?'

'অভিরাম সমুদ্রে ডুবে গেছে। এক্ষুণি ওকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। জানি না এতক্ষণে বেঁচে আছে কিনা। আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম। আমার কথা শুনে ছোটমামা একটু সহজ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বোস, সব কথা ভাল করে শুনি। অভিরামের সঙ্গে তোর পরিচয় হ'ল কি করে?'

'সে এক লম্বা কাহিনী। সেসব কথা বলার এখন সময় নেই, পরে বলব। আপনি আগে ওকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।' আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'অভিরাম সমুদ্রে ডুববে না। তোর চিন্তার কোন কারণ নেই। অভিরামের সঙ্গে কি করে তোর আলাপ হল তাই বল।'

ছোটমামার কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। ওইটুকু ছেলে সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে তা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। অভিরাম হয়তো ভাল সাঁতার জানে, কিন্তু ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস আছে। কতক্ষণ একটানা ও সাঁতার দিতে পারবে? এদের ব্যাপারস্যাপার আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে কি অভিরামের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? কে জানে? ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোটমামার উল্টোদিকে চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে অভিরামের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ব্যাপারটা ওঁকে খুলে বললাম।

ছোটমামা মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, 'তোকে নতুন মানুষ পেয়ে অভিরাম হয়তো তোর সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল।'

'কিন্তু ও যে বলল সারাদিন নাকি ও সমুদ্রে থাকে। ও কি পাগল? নাকি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল?'

ছোটমামা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, 'যা কোয়ার্টার্সে যা, আমি একটু পরে আসছি। এসে অভিরামের সব কথা বলবখন।

আমি উঠে পড়লাম। বেশ বুঝতে পারলাম অভিরামকে ঘিরে কিছু রহস্য আছে। সে রহস্য জানতে হলে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ছোটমামা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আমাকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখে একটু হেসে বললেন, 'কিরে এখনও বসে-বসে তুই কি অভিরামের কথা চিন্তা করছিস?'

বললাম, 'না, তা ঠিক নয়। তবে ব্যাপারটা আমাকে বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে। ওইটুকু ছোট ছেলে সারাদিন সমুদ্রে একা একা সাঁতার কেটে বেড়ায়, বিপদ আপদ ঘটা তো বিচিত্র নয়। তোমরা এ ব্যাপারে ওকে কিছু বলো না কেন?'

ছোটমামা কিছু না বলে একটু হাসলেন।

'অভিরামের যে কিছু বিপদ ঘটে নি সেই খবরটা আমি চাই। আর ও যদি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় তা হলে আমি কিন্তু তোমাকেই দায়ী করব ছোটমামা। কথাটা মনে রেখো।' নির্বিকার ভাবটা আমাকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করে তুলছিল। তাই আমার মুখ থেকে কড়া কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

ছোটমামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'ঠিক আছে সেসব পরে ভাবা যাবে খন। এখন খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।' বলে জামাকাপড় বদলে রান্না ঘরে ঢুকে পড়লেন উনি। টোস্ট ওমলেট বানিয়ে কফির জল হীটারে চাপিয়ে আমাকে ডাকলেন ডাইনিং টেবিলে। একটা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, খেতে শুরু কর।'

তখনো আমার রাগ পড়ে নি। মনে হচ্ছিল ছোটমামা কী রকম যেন বদলে গেছেন। তা না হলে একটা ছোট ছেলে সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পড়েছে একথা শুনেও উনি এমন নির্বিকার হয়ে থাকছেন কি করে? যেন কিছুই হয় নি। আমি গোঁজ হয়ে ওমলেট টোস্ট শেষ করলাম। ছোটমামা খাওয়া শেষ করে দু কাপ কফি বানিয়ে বললেন, 'চ বারান্দায় বসে কফি খাওয়া যাক। চমকার হাওয়া।'

আমি কোন কথা না বলে কফির কাপটা তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ছোটমামাও পাশাপাশি খালি চেয়ারটায় বসে আরাম করে কফির কাপে চুমুক দিলেন। আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম। বেলা পড়ে এসেছে। সমুদ্রের রঙ এখন ঘন নীল। হু হু করে ভেসে আসছে সমুদ্রের হাওয়া। ঢেউভাঙার শব্দ এখানে বসেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আমি এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অভিরামের কোন চিহ্নই সেখানে ছিল না।

'তোকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবো বলে এখানে আসতে বলেছিলাম।' কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন ছোটমামা। 'তা তার সঙ্গে তোর আগেই দেখা হয়ে গেছে।' 'অভিরামই তোমার সেই আশ্চর্য জিনিস।' আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ।' ছোট্ট করে জবাব দিলেন ছোটমামা। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উনি বলতে শুরু করলেন, 'অভিরাম আমাদের আশার আলো।'

'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলো।' ছোটমামার দিকে চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে বসলাম আমি।

'পৃথিবীতে যে হারে মানুষ বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ডাঙায় আর মানুষের জায়গা হবে না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে বসবাসের জন্য নামতে হবে সমুদ্রের জলে। সমুদ্রের তলায় গড়ে উঠবে শহরের পর শহর। ইতিমধ্যে সমুদ্রের তলায় ছোটখাটো শহর তৈরীর প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষ আয়ত্ত করে ফেলেছে। মানুষের প্রাণধারণের জন্য চাই অক্সিজেন। কৃত্রিম শহরের মধ্যে সমুদ্রের জল থেকে অক্সিজেন তৈরী করে নেওয়া চলতে পারে। কিন্তু শহরের বাইরে যেতে হলেই অক্সিজেন ট্যাঙ্ক পিঠে বেঁধে বেরুতে হবে। সমুদ্রে বাস করতে গেলে সমুদ্র-সম্পদকে আহরণ করতে হবে। সমুদ্রে আছে জ্বালানী তেল, ম্যাঙ্গানীজ, ফসফেট, লোহা, সোনা এমনকি হীরে। তাই ষাটের দশক থেকেই প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন সমুদ্র সম্পর্কে। ভারতবর্ষেও সমুদ্র-গবেষণা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একটা গোপন পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন যাতে স্বাভাবিক উপায়ে মানুষ সমুদ্রকে জয় করতে পারে। সামুদ্রিক প্রাণীরা, বিশেষ করে মাছেরা কী করে সমুদ্রের জল থেকে অক্সিজেন শুষে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের ভিতর চলাফেরা করে তা ভাল করে পরীক্ষা করা হয়েছে। কানকোর ঝিল্লীগুলো ওদের এ ব্যাপারে মস্ত সহায়। আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম এই ঝিল্লীর সাহায্য নেওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে। কৃত্রিম ঝিল্লী তৈরী করে সেগুলো কিছু ভাঙার জীবের দেহে অপারেশানের সাহায্যে লাগিয়ে নিয়ে তাদের জলে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল। ফল ভালই হল। এই জীবগুলো জলে কানকোর সাহায্যে এবং ডাঙায় ফুনফুসের সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বেশ ভালভাবেই চালাতে লাগলো। আমরা আশান্বিত হলাম। এরপর আমরা এগুলাম মানুষের উপর পরীক্ষার কাজে। কিন্তু এরকম একটা পরীক্ষার জন্য মানুষ জোগাড়

অভিরাম আমাকে দেখে যেন খুশিই হল

করা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল। তারপর আমরা পেলাম অভিরামকে।'

ছোটমামার কথায় বাধা পড়ল। কলিং বেলটা দুবার বেজে উঠল। ছোটমামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। তারপর দ্রুত পায়ে দরজা দেওয়ার জন্য চলে গেলেন। আমি বারান্দায় বসে রইলাম। একটু পরেই ছোটমামা যাকে সঙ্গে করে বারান্দায় ফিরে এলেন তাকে দেখে আমার এতক্ষণের দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে কেটে গেল। অভিরাম আমাকে এখানে দেখে যেন খুশিই হল। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই সেকথা বুঝতে পারলাম আমি। ও যেন একটু লজ্জাও পেয়েছে। দুষ্টুমি করে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। এক্ষুণি ও সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। সারা গা মাথা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ওর হাতে দুটো অদ্ভুত রঙীন জিনিস। ও দুটো ও আমার দিকে এগিয়ে দিল কোন কথা না বলে। আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। একটা গোলাপী আর একটা হলদে রঙের প্রবাল যেন দুটো ছোট ছোট প্রবালের গাছ। ভারী সুন্দর দেখতে। ও দুটো আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে ও ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই ছোটমামা ওকে আটকালেন।

'অভিরাম এ হচ্ছে জয়, আমার ভাগ্নে।'

অভিরাম কোন কথা না বলে ছোটমামার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

ছোটমামা বললেন, 'বোসো।'

সামনের আর একটা খালি চেয়ারে ও একটু জড়সড় হয়ে বসলো। ছোটমামা এবার আমার দিকে তাকিয়ে পুরানো কথার খেই ধরে বললেন, 'তোমাকে বলছিলাম না অবশেষে হঠাৎই অভিরামকে পাওয়া গেল। ওর বয়েস তখন দশ বছর। ওর বাবা আমাদের ইনস্টিট্যুটেরই কর্মচারী। আমাদের গবেষণাগারেই সে কাজ করত। আমাদের সমস্যার কথা জানতে পেরে নিজে থেকে অভিরামকে আমাদের হাতে তুলে দিল। আর এই পরীক্ষার পুরো ভার পড়ল আমার হাতে। মানুষ নিয়ে পরীক্ষা। মনে মনে একটু যে ভয় পেলাম না তা নয়। তবে মনকে শক্ত করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে একদিন কাজে নেমে পড়লাম। মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা এতবড় ঝুঁকি নিতে বাধ্য হলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অভিরামের উপর পরীক্ষা সফল হল। সে বছর দুয়েক আগেকার ঘটনা। সেই থেকে অভিরাম সমুদ্র-মানুষ।' ছোটমামা থামলেন। তারপর অভিরামকে প্রশ্ন করলেন, 'অভিরাম! ডাঙা ভাল, না সমুদ্র ভাল?'

অভিরাম সেই রকম ফ্যাসফ্যাসে গলায় জবাব দিল, 'সমুদ্র বেশি ভাল।'

'সমুদ্রের তলায় ঘোরাফেরা করতে তোমার কি কোন ভয়?'

'না, একটুও না। বরং ডাঙায় বেশিক্ষণ থাকতে আমার ভাল লাগে না।' তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে অভিরাম বলল, 'আমি যাই।'

ছোটমামা বললেন, 'একটু দাঁড়াও।' বলে চেয়ার থেকে উঠে উনি অভিরামের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর ওর মাথার সেই প্লাস্টিকের টুপি বা মুখোশটা টেনে খুলে ফেললেন। বাইরের বারান্দায় তখন আলো কমে এসেছে। সেই ম্লান আলোয় অভিরামের গলার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ওর গলার দু' দিকে দুজোড়া লাল কানকো স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণে ঢাকা। আমার সারা শরীর সিরসির করে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারলাম না। অভিরামের সারা মুখে হাসি ছড়ানো। হঠাৎ ও ছোটমামার হাত থেকে টুপিটা টেনে নিয়ে পরে ফেললো তারপর তড়াক করে বারান্দা টপকে বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়লো। দেখলাম বালির মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে আবার ও সমুদ্রের দিকেই চলেছে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমরা কেউ কোন রকম বাধা দিতে পারলাম না। সমুদ্রের সাদা ফেনার মধ্যে অভিরাম অদৃশ্য হল।

ছোটমামা বললেন, 'অভিরাম আমাদের আশার আলো। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাকে এগিয়ে চলতে হবে। এতদিন মানুষ পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগে বসবাস করেছে। আজকে গোটা পৃথিবীতে সে বাস করবার অধিকার অর্জন করলো।'

ছোটমামা কথায় আমার কান ছিল না। আমি প্রবালের গাছ দুটো নাড়াচাড়া করছিলাম। আমার মনে হল ও দুটো যেন ডাঙার মানুষকে সমুদ্রের নিমন্ত্রণ-পত্র যা সে পাঠালো তার আপন সন্তান অভিরামের হাত দিয়ে। আমি বাইরে তাকালাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে। শ্বেত শুভ্র ফেনাগুলো প্রবল গর্জনে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রতটে। মনে হল ওই ঢেউগুলো এতকাল ধরে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে। সে আহ্বানের অর্থ আজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। অভিরামের জন্যে গর্বে আমার বুক ভরে উঠলো।

84A হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-25

এশিয়াড ঃ 1982

মঞ্জিল সেন

রাজধানী দিল্লিতে নবম এশীয় ক্রীড়া শুরু হয়েছে 19 নভেম্বর, চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এবার মোট বত্রিশটি সদস্য রাষ্ট্র এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেছে। উল্লেখযোগ্য, নবম এশিয়ান গেমসে ইজরায়েলকে আমন্ত্রণ না জানাবার ফলে দিল্লি এশিয়াড আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সমর্থন পাবে না।

এশিয়ান গেমসের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু ভারত এবং প্রথম এশিয়ান গেমসের আসর বসেছিল ভারতবর্ষে—1951 সালের চৌঠা থেকে এগারোই মার্চ নয়াদিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

পরবর্তীকালে এশিয়ান গেমসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ম্যানিলা (1954), টোকিও (1958), জাকার্তা (1962), ব্যাঙ্কক (1966 ও 1970), তেহেরান (1974) এবং ব্যাঙ্কক (1978)।

এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে একটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের সর্বপ্রথম চিন্তা করেছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং এবং অধ্যাপক জি, ডি, সোধি। এশিয়ান গেমস শুরু করার ব্যাপারে অধ্যাপক সোধির নিরলস পরিশ্রম অনস্বীকার্য এবং পাতিয়ালার মহারাজার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। পাতিয়ালার মহারাজা এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক সোধি।

1951 সালের প্রথম এশিয়ান গেমসে এগারোটি দেশ যোগ দিয়েছিল। উদ্বোধনী মাঠে উপস্থিত ছিলেন চল্লিশ হাজার দর্শক। স্টেডিয়ামকে ঘিরেছিল এগারোটি দেশের পতাকা এবং ওখানে ওড়ানো হয়েছিল হাজার হাজার বেলুন ও পায়রা। উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। প্রায় 500 প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন, 1954তে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় যখন দ্বিতীয় এশীয় ক্রীড়ার আসর বসে তখন প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা আঠারোয় দাঁড়িয়েছিল।

1958তে তৃতীয় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাপানের রাজধানী টোকিওতে। সেবার অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ছিল কুড়ি আর 1400/1300 প্রতিযোগী। টোকিওতে সর্বপ্রথম হকি প্রতিযোগিতায় তালিকাভুক্ত হয়।

হকিতে সোনা সেবার পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছিল, আর ভারত পেয়েছিল রূপো। ভারতীয় দৌড়বীর মিলখা সিং দুশো ও চারশো মিটার দৌড়ে শীর্ষস্থান লাভ করে জোড়া সোনা লাভ করেছিলেন।

1962তে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ এশীয় ক্রীড়া। ইজরায়েল ওতাইওয়ানকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। এ নিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সেবার ফুটবলে ভারত সোনা পেয়েছিল। কুড়িটি দেশের দেড় হাজার প্রতিযোগী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

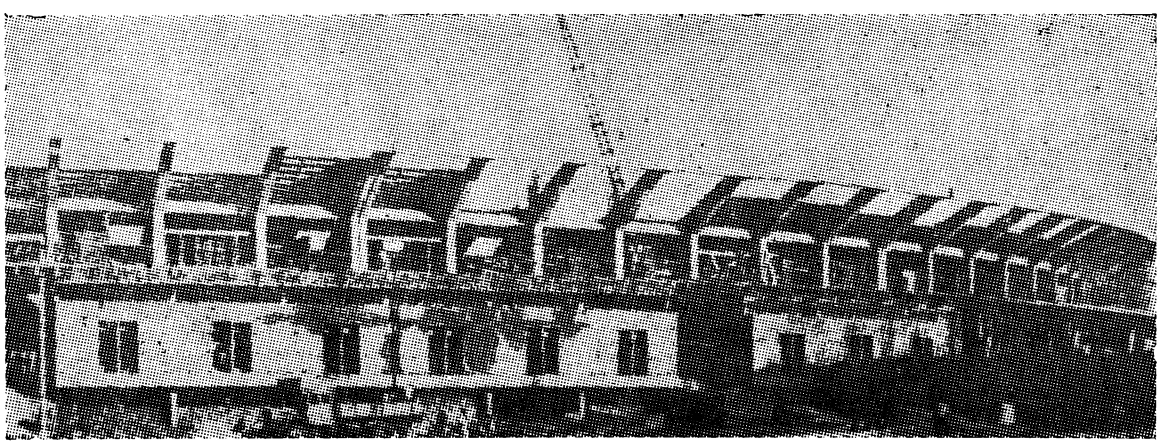

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের একাংশ

1966তে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে বসল পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার আসর। ভারত এই একবারই পাকিস্তানকে হারিয়ে হকিতে সোনা পেল।

1970 সালে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাঙ্ককে। 1966 সালের মত এবারও প্রতিযোগিতার যোগ দিয়েছিল আঠারোটি দেশ, প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল দু'-হাজার। ভারতীয় মহিলা অ্যাথলেট কমলজিৎ সানধু 400 মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

1974 সালে সপ্তম এশীয় ক্রীড়া হয় ইরানের রাজধানী তেহেরানে। চীন এই প্রথম অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং পদক তালিকায় তার স্থান ছিল তৃতীয়। পঁচিশটি দেশের প্রায় তিনহাজার প্রতিযোগী উপস্থিত হয়েছিলেন তেহেরানে। তবে তাইওয়ানকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি।

1978-তে অষ্টম এশীয় ক্রীড়া হবার কথা ছিল ইসলামাবাদে। কিন্তু পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত অক্ষমতা প্রদর্শন করায় আবার থাইল্যাণ্ডকেই ভার নিতে হয়। শীর্ষ স্থান বজায় রাখতে জাপানকে চীনের শক্ত মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ভারতের গীতা জুৎসি 800 মিটার দৌড়ে প্রথম এবং 1500 মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন।

প্রথম ও সর্বশেষ এশীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের স্থান ও পদকের একটা খতিয়ান এখানে দেওয়া হল।

1951 ঃ বিভিন্ন বিষয় বা ইভেণ্টস 55

স্থান	অংশ গ্রহণকারী মোট দেশ		মোট প্রতিযোগী
নিউ দিল্লি	11		500
পদকপ্রাপ্ত দেশ (ব্যক্তিগত পদক)	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ
জাপান	20	15	14
ভারত	12	13	19
ইরান	4	5	0
সিঙ্গাপুর	3	6	2
ফিলিপাইনস	3	4	6
ইন্দোনেশিয়া	0	0	4
(সমষ্টিগত পদক)			
ভারত	3	3	2
জাপান	3	2	1
ফিলিপাইনস	2	1	2
সিঙ্গাপুর	1	2	0
ইরান	0	1	1
ইন্দোনেশিয়া	0	0	1

1978 ঃ ইভেণ্টস—200

স্থান	অংশ গ্রহণকারী		মোট প্রতিযোগী
ব্যাঙ্কক	মোট দেশ 21		3000
পদক প্রাপ্ত দেশ	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ
জাপান	70	59	49
চীন	51	51	46
দঃ কোরিয়া	18	20	31
উঃ কোরিয়া	15	13	15
থাইল্যাণ্ড	11	22	19
ভারত	11	11	6
ইন্দোনেশিয়া	8	7	18
পাকিস্তান	4	4	9
ফিলিপাইনস	4	4	6
ইরাক	2	4	6
সিঙ্গাপুর	2	1	3
মালয়েশিয়া	2	1	3
মঙ্গোলিয়া	1	3	5
লেবানন	1	1	0
সিরিয়া	1	0	0
বার্মা	0	3	3
হঙ কঙ	0	2	3
শ্রীলঙ্কা	0	0	2
কুয়ায়েত	0	0	1

এবার নবম এশিয়ান গেমসে মূল যে বাইশটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার মধ্যে নবতম সংযোজন হল হ্যাণ্ডবল।

জাপান এবার পাঠাচ্ছে 465 দলের এক বিরাট দল, তার মধ্যে 254 জন পুরুষ এবং 101 জন মহিলা ক্রীড়াবিদ। জাপানের পরই বড় দল চীনের, তাদের দলে থাকছে মোট 445 জন। দক্ষিণ কোরিয়া 401 জনের দল পাঠাচ্ছে। ভারতের দলে থাকবে মোট 644 জন।

এবার এশিয়াডে সাঁতার' নৌ-বহর, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, বাস্কেটবল, ভলিবল, ইত্যাদি মোট 22টি বিষয় এবং ইভেণ্টস দুশো ওপর। 1978 সালে বিষয় ছিল ঊনত্রিশটি এবং ইভেণ্টস 200, এবার তার চাইতে বেশি।

52A সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-26

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

তন্তু আলোকবিজ্ঞান

অলক চক্রবর্তী

অত্যন্ত পালিশ করা রূপো অথবা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে আলো পাঠানোর ব্যাপারটা বহু বছর ধরেই জানা ছিল। এই নলের এক প্রান্ত দিয়ে আলো ঢোকার পরে নলের ভিতরের দেওয়ালে বার বার প্রতিফলিত হতে হতে, শেষকালে নলের অন্য প্রান্তে পৌঁছে নল থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু প্রতিটি প্রতিফলনে কিছু পরিমাণ আলোকশক্তি নষ্ট হয় বলে এইরকম নলের মধ্যে বহুবার প্রতিফলনে মোটের উপর বেশ কিছু পরিমাণ আলো অন্যভাবে ব্যয়িত হয়ে যায়। তাই নলের ভিতরে এইরকম বহুবার প্রতিফলনের সাহায্যে আলো পাঠানোর পদ্ধতিটির ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রায় ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে কার্যতঃ কোন অপচয় ছাড়াই আলোকের বহুসংখ্যক পর পর প্রতিফলন ঘটাবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি ঘন মাধ্যম (যথা কাচ) এবং একটি লঘু মাধ্যমের (যথা বায়ু) বিভেদতলে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটিয়ে, এটা করা সম্ভব হয়েছে। আলো কাচের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কাচ ও বায়ুর বিভেদতলে একটি নির্দিষ্ট মানের অথবা তার চেয়ে বেশি যে কোন মানের কোণে আপতিত হলে আপতিত অংশই প্রতিসৃত হয়ে কাচ ছেড়ে বাইরের কোনো বায়ুতে যায় না, এর সবটুকুই বিভেদতলে প্রতিফলিত হয়ে কাচের মধ্যেই থেকে যায়। নলের ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সাহায্যে আলো পাঠালে সর্বনিম্ন আলো নষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে ফাঁপা নলের

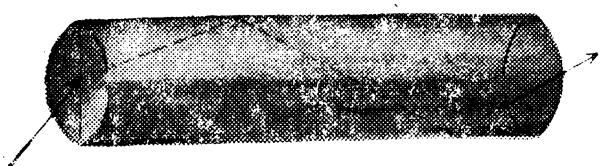

একটি আলোক-নলে কাচ ও বায়ুর বিভেদতলে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

বদলে আজকাল পূর্ণগর্ভ দণ্ড ব্যবহার করা হচ্ছে (fig-1)। এই দণ্ডগুলি কাচ অথবা অ্যাক্রাইলিক প্লাসটিক দিয়ে তৈরী।

একটিমাত্র কাচের অথবা প্লাসটিকের দণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোকশক্তি পাঠানো সম্ভব হলেও প্রতিবিম্ব পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে আসা আলোক রশ্মিগুলি একই নলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পথ বরাবর যায় বলে রশ্মিগুলি বেরোবার পর লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিম্বগুলি এমনভাবে মিশে যায় যে, লক্ষ্যবস্তুটিকে আর চেনার উপায় থাকে না। তাই প্রতিবিম্ব পাঠানোর কাজে একসঙ্গে অনেকগুলি নল ব্যবহার করা দরকার। লক্ষ্যবস্তুর ছোট ছোট অংশ থেকে আলোকরশ্মি এক একটি আলোক-নলের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে সমস্ত প্রতিবিম্বের বিভিন্ন অংশ তৈরী করে। এতে ব্যবহৃত কাচের অথবা প্লাসটিকের নলগুলির ব্যাস এত ছোট যে সেগুলিকে নল না বলে তন্তু বলা হয়। প্রতিবিম্ব পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত অনেকগুলি তন্তুর এই ধরনের সমবায়কে বলা হয় ফাইবার-স্কোপ (Fibre scope) অথবা তন্তুদর্শী (fig-2)। তন্তু আলোকবিজ্ঞানে মূলতঃ অন্তর্দর্শী উপরই আলোচনা করা হয়।

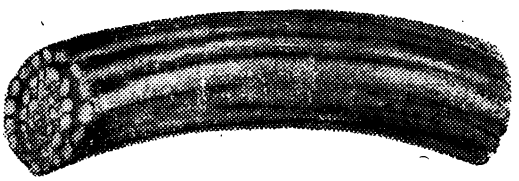

একাধিক আলোক নলের সমবায়ে গঠিত একটি ফাইবারস্কোপ

নমনীয় তন্তুদর্শী ব্যবহার করে বক্র পথেও প্রতিবিম্ব প্রেরণ করা যায়। এভাবে একজন লোকের পক্ষে তার নিজের কানের প্রতিবিম্ব দেখাও সম্ভব হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এইরকম তন্তুদর্শী তৈরীর কাজে খুব শক্ত বাধা ছিল। সরল তন্তুগুলি পরস্পরের গায়ে লেগে থাকার জন্য একটি তন্তু থেকে আলো অপর তন্তুতে ঢুকে পড়ে এবং প্রতিবিম্ব সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত তন্তুগুচ্ছে, গুচ্ছের এক প্রান্তে তন্তুগুলির আপেক্ষিক অবস্থান গুচ্ছের অপর প্রান্তে তন্তুগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের সঙ্গে পুরোপুরি একরকম হতে হবে। তন্তুগুচ্ছের মধ্য অংশে অবশ্য তন্তুগুলির বিন্যাস এত বেশি নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে তন্তুগুলিকে কমবেশি আলগা ও নমনীয় রাখা যায়।

একটি সন্তোষজনক প্রতিবিম্ব পাওয়ার জন্য একটি গুচ্ছে বহুসংখ্যক তন্তু যুক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ব্যবহৃত অন্তদর্শীতে প্রায় 750000 টি তন্তু থাকে। এই তন্তুগুলির প্রত্যেকটির ব্যাস 0·01 মিলিমিটার।

কোন কোন ক্ষেত্রে তন্তুর ব্যাস 0·005 মিলিমিটারও হতে পারে। এটিই হল ব্যাসের সর্বনিম্ন মান্।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব প্রেরণের পরিবর্তে শুধুমাত্র আলো পাঠাবার কাজেই তন্তুগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের তন্তুগুচ্ছকে তন্তুদর্শী না বলে বলা হয় নমনীয় আলোক-নির্দেশক। একটি গুচ্ছে তন্তুগুলিকে কোনরকম নির্দিষ্ট বিন্যাস ছাড়াই একত্রে যুক্ত করা যায়। এইরকম তন্তুগুচ্ছকে "অসম্বদ্ধ" বলেও অভিহিত করা হয়। অপর পক্ষে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত অন্তদর্শীগুলিকে "সম্বদ্ধ" বলে অভিহিত করা হয়। একই আয়তনের "সম্বদ্ধ" গুচ্ছের তুলনায় "অসম্বদ্ধ" গুচ্ছ অনেক সহজে এবং অনেক কম খরচে তৈরী করা হয়।

তন্তু আলোকবিজ্ঞানের নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আজকাল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোকশক্তির বাহক নমনীয় আলোক-নির্দেশকগুলি সূক্ষ্ম শল্যচিকিৎসায় আলোকিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলি যন্ত্রপাতির প্যানেল আলোকিত করার ফলে প্রাপ্ত প্রতিবিম্বে বিকৃতি দেখা যায়। আবার গায়ে গায়ে লাগার সময় তন্তুগুলিতে যে সমস্ত আঁচড় দেখা যায়, তার মধ্য দিয়েও আলোর অপচয় ঘটে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 1950 সালে এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে দুটি স্বচ্ছ অংশ নিয়ে গঠিত এক ধরনের তন্তু তৈরী করা সম্ভব হয়। এই ধরনের তন্তুতে একটি ভিতরের অংশ এবং একটি বাইরের আবরণ থাকে। ভিতরের অংশটির প্রতিসরাঙ্ক বেশি এবং বাইরের প্রতিসরাঙ্ক কম হয়।

কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক হল শূন্যে আলোকবেগের সঙ্গে সেই মাধ্যমে আলোর গতিবেগের অনুপাত। এভাবে গঠিত তন্তুর উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট ভিতরের অংশ এবং নিম্ন প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট বাইরের আবরণের মধ্যবর্তী বিভেদতলে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে পারে। মূল প্রতিফলক-তলটি বাইরের আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় অন্যান্য প্রতিফলক-তল থেকে পৃথক থাকে বলে তলের উপর অবস্থিত আঁচড়গুলির মধ্য দিয়ে আলোর অপচয় হয় না। এছাড়া এক তন্তু থেকে অন্যান্য তন্তুতে আলোর অবাঞ্ছিত প্রবেশের সমস্যাগুলি কার্যতঃ থাকে না। আজকাল তন্তু আলোকবিজ্ঞানের নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত প্রায় সমস্ত যন্ত্রেই এই তন্তুগুলি ব্যবহার করা হয়। সংযুক্ত তন্তুগুচ্ছগুলিতে সাধারণতঃ ধাতুর অথবা প্লাসটিকের নমনীয় খাপ দেওয়া থাকে। নিচের চিত্রে (fig-3) এইরকম তন্তুর একটি নকসা দেখানো হয়েছে।

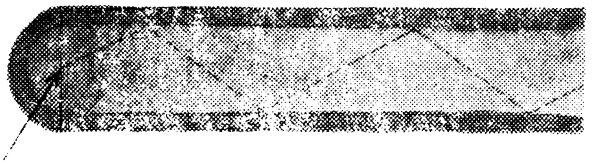

একটি আবৃত তন্তুর মধ্য দিয়ে আলোর সঞ্চালন

একটি আবৃত তন্তুর মধ্য দিয়ে আলোর সঞ্চালন করতে এবং দুর্গম স্থানসমূহের অগ্নি নির্ণয়েও ব্যবহৃত হয়। তন্তুদর্শীগুলির প্রয়োগক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। যেমন, আলোকতন্তুর প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত গ্যাস-ট্রোস্কোপ বা পাকস্থলীদর্শী নামক যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসকের পক্ষে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ দেখা সম্ভব হয়েছে। অধস্তক সূচির আকারের একটি ছোট পর্যবেক্ষণ যন্ত্র পেশীতন্তু, চর্মকলা এবং রক্তকোষ দেখার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ হৃদপিণ্ড সমেত সংবহনতন্ত্রের ভিতরের বেশির ভাগ অংশই দেখা সম্ভব হবে। বাস্তবিক পক্ষে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগনির্ণয়ের কাজে অন্তদর্শীর ব্যবহার আশা-ব্যঞ্জক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

শিল্পক্ষেত্রেও তন্তুদর্শীর ব্যাপক ব্যাবহার হচ্ছে। অগম্য অঞ্চলগুলিতে কার্যাবলীর পর্যবেক্ষণ অথবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তন্তুদর্শী ব্যবহার করা হয়। তন্তুদর্শী দিয়ে টারবাইন পাত, বয়লার নল এবং পরমাণুচুল্লীর ত্রুটি ও ফাটলগুলি পরীক্ষা করা যায়। গ্যাসোলীন আধারে বসানো জ্বালানী-তল নির্দেশকগুলি পরীক্ষা করার জন্য তন্তুদর্শী ব্যবহার করা হয়েছে। বিমানের পাখার মধ্যে অসতর্ক কর্মীদের ফেলে রাখা যন্ত্রপাতি তন্তুদর্শীর সাহায্যে নির্ভুলভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।

একাধিক তন্তুদর্শী একটি কটিন পাতে একসঙ্গে জুড়ে তৈরী করা ফলক-পাত দূরদর্শন চিত্রনলে এবং অন্যান্য ক্যাথোড রশ্মি নলে ব্যবহৃত হয়েছে। নলের ভিতর ফসফোর (Phosphor) তলে গঠিত প্রতিবিম্ব ফলক-পাতের মাধ্যমে নলের পর্দায় অথবা সামনের তলে পাঠানো হয়।

তন্তুদর্শীর সাহায্যে ছবি অথবা দালিলের সাংকেতিক রূপ প্রস্তুত করা যায় অথবা প্রস্তুত সাংকেতিক রূপের পাঠোদ্ধার করা যায়। একটি তন্তুগুচ্ছের একপ্রান্তে তন্তুগুলির সজ্জা অপর প্রান্তে সজ্জা থেকে আলাদাভাবে প্রস্তুত করা যায়। এর ফলে তন্তুগুচ্ছের একপ্রান্ত দিয়ে

এবার কলসপত্রী উদ্ভিদের সম্বন্ধে কিছু বলি। গোটা বিশ্বে মোটামুটি প্রায় 65 রকম কলসপত্রী উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই খুব ছোট। কেবলমাত্র নিপেনথিস্ খাসিয়ানা (Nepenthes khasiana) নামে একটি প্রজাতি ভারতবর্ষের খাসি জয়ন্তিয়া এবং গারো পার্বত্য এলাকায় দেখা যায়। এটিকে লতানো গুল্ম বলা যেতে পারে। এই গাছের পাতাগুলো পরিবর্তিত হতে হতে একটি কলসীর আকার ধারণ করে। তার মুখের উপর থাকে একটা ঢাকনা, আকার সাধারণতঃ 10 cm. থেকে 20 cm. মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মুখের ঠিক নিচেই থাকে চুলের মত অঙ্গ, আর নিচের দিকে থাকে অগণিত পুষ্টিগ্রন্থি।

ওই উদ্ভিদের মুখ থেকে একটা সুধামাখা সুবাস নির্গত হয়। পতঙ্গরা (সাধারণত ফড়িং, পঙ্গপাল, প্রজাপতি ইত্যাদি) এই সুবাসের খোরাক নেবার জন্যে যেই না এসে কলস পাতার উপর বসে, অমনি হড়কে নিচে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঢাকনাও বন্ধ হয়ে যায়।

চিত্রিত উপরের ঢাকনাকে পতঙ্গরা অনেক সময় ফুল মনে করেও ভুল করে, এবং কলস পাতার উপর বসে। যাই হোক পতঙ্গ এবার ভিতরে আটকা পড়ে আছে। তার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন! সেই 'আলিবাবা' নাটকে যেমন কাসেম গুপ্তধনের আস্তনায় ঢুকে বের হবার মন্ত্র (চিচিং ফাঁক) ভুলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই পতঙ্গটি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের মৃত্যুর পর আগের মতই পুষ্টিপদ্ধতি শুরু হয়। বিভিন্ন রূপান্তরণের পর সেটি অ্যামিন হিসাবে শোষিত হয়।

আর তাতেই তো কেল্লা ফতে!

286 সি ডি ষ্টেশন রোড, পোঃ অণ্ডাল, জেঃ বর্ধমান

ভাবনা

ছায়াপথ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

ছায়াপথ বা স্বর্গগঙ্গা হল মহাকাশে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বর্তমান বহুসংখ্যক তারা এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের সমষ্টি। আমাদের সূর্য ও তার গ্রহগুলি এবং খালিচোখে দেখা যায় এমন সমস্ত নক্ষত্র এই ছায়াপথের মধ্যে পড়ে। তবে সাধারণত উজ্জ্বল পটি অথবা বলয় যার মধ্যে অধিকাংশ শ্রেণীর নক্ষত্র জড়ো হয়েছে শুধুমাত্র তার জন্যেই এই নামটি ব্যবহার করা হয়। ছায়াপথের সর্পিল বাহুগুলিতে উজ্জ্বল উষ্ণ নক্ষত্র, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মধ্যবর্তী গ্যাসের (প্রধানত হাইড্রোজেন) মেঘ এবং ধূলিকণার আধিক্য দেখা যায়। 1951 খ্রীষ্টাব্দে ডব্লু ডব্লু মরগান (W. W. Morgan) নামে একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদের তিনটি বাহুর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ছায়াপথের বাহুগুলির অস্তিত্বের কথা প্রথম জানা যায়। সূর্য এবং তার গ্রহগুলিকে নিয়ে গঠিত সৌরজগৎ প্রায় 1300 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একটি বাহুর ভিতরের প্রান্তের দিকে রয়েছে। গ্যাসীয় এবং কঠিন পদার্থের মিশ্রণে গঠিত অ্যান্ড্রোমেডা (Andromeda) নীহারিকাকে আকাশে ছোট এক টুকরো উজ্জ্বল পটির মতো দেখায়। কিন্তু আসলে আকারে এটি ছায়াপথের মতোই বিশাল এবং আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে এর চোখে পড়ার মতো সাদৃশ্য আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট প্যালামোর-এ অবস্থিত 200 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি দূরবীন দিয়ে প্রায় দশ কোটি তারা দেখা যায়।

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

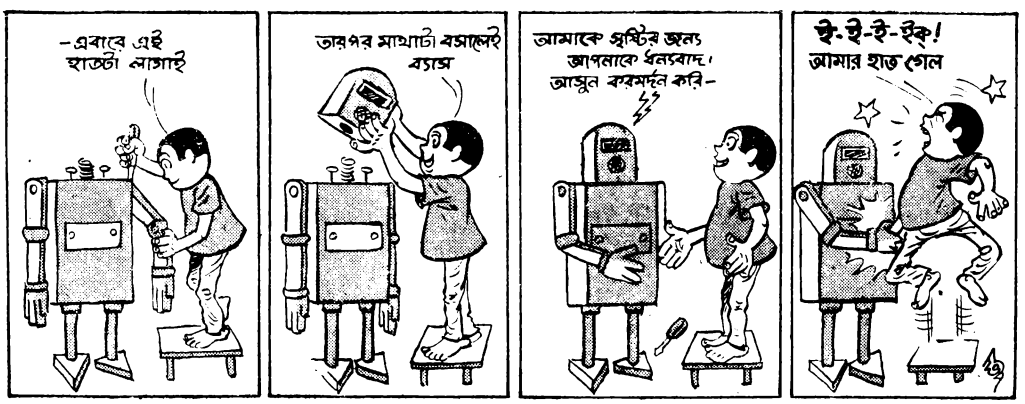

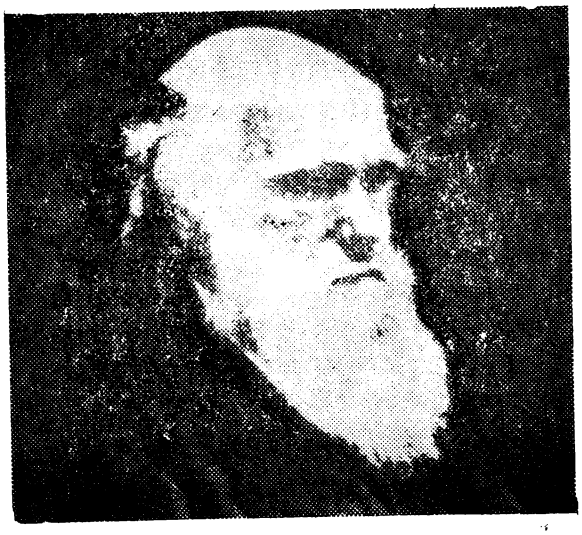

প্রকৃতিবিদ চার্লস রবার্টডারউইন

(1809—1882)

অশোককান্তি সান্যাল

1831 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। লণ্ডনের কেমব্রীজ শহরে সদ্য বি. এ. পাশ এক যুবক ভাবছে—'কি করে বাবাকে রাজি করানো যাবে। এ সুযোগ যে কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না! জীবনের প্রার্থিত বস্তুর মধ্যে এটি যে অন্যতম। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো জীবনে কিছু করি নি। সুতরাং যেভাবেই হোক তাঁর সম্মতি চাই-ই।'

কেমব্রীজের অধ্যাপক হেনস্‌লো এই যুবকের বিশেষ পরিচিত। আজই তাঁর চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন ঃ 'বৃটিশ সরকারের ইচ্ছায় ক্যাপ্টেন পিচ্‌রয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপগুলিতে বৈজ্ঞানিক অভিযানের উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ রওনা হচ্ছে। পিচরয়ের ইচ্ছা এই অভিযাত্রীদলে একজন প্রকৃতিবিদ থাকুক। কেমব্রীজেরই অধ্যাপক জর্জ পিককের মাধ্যমে আমার কাছে একজন বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃতিবিদের খোঁজ চাওয়া হয়েছে। তুমি একজন স্বীকৃত প্রকৃতিবিদ না হলে তোমার ছাড়া অন্য-কারো নাম সুপারিশ করতে পারি নি। তোমার দক্ষতা সম্বন্ধে তুমি মোটেই সন্দিহান হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই এ কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।' চিঠিটা পাওয়ার পর যুবক অনেকবার পড়েছে আর অনুভব করেছে এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। স্কুলে পড়ার সময় "ওয়াণ্ডার্স অব্ দি ওয়ার্ল্ড" বইটি পড়ে অজানা দেশ দেখার যে ইচ্ছা জেগেছিল তাই কি সফল হবে?

যুবক তো রাজী। কিন্তু তার আশঙ্কা যে সত্যি হতে চলেছে! বাবার সম্মতি মেলে নি। এই অভিযানে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন। তবে একথাও বলেছেন যে, যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই অভিযানে অংশ গ্রহণে পরামর্শ দেন তা হলে আমার সম্মতি পাবে। যুবকটি ভাবলো এ প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই জানিয়ে দিলো যে, এ সুযোগ গ্রহণে অসমর্থ দুঃখিত। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হবেই। পরের দিন সে তার কাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কাকাকে সব কথা বললো। কাকা বললেন ঃ 'তোমার এ সুযোগ কখনোই ছাড়া উচিত নয়। তুমি আজই তোমার বাবাকে আমার অভিমত জানাও।' ভাইয়ের বিচক্ষণতার প্রতি দাদার অগাধ আস্থা ছিল। বাবা রাজী হয়ে গেলেন। প্রকৃতিবিদ হিসাবে নিয়োগপত্র এলো 1 সেপ্টেম্বর। পরে সে জেনেছিলো তাকে নিয়োগ করার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন রয় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যে কোন মানুষের মুখের আকৃতি দেখে সেই মানুষের চারিত্রিক গঠন সম্বন্ধে জানতে পারেন। ফলে ঐ যুবকের নাকের আকৃতি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এ ধরনের নাকওয়ালা লোকের কর্ম দক্ষতা কম হয় ও সামুদ্রিক অভিযানে তারা অসমর্থ। তবুও তিনি এই যুবককে সহযাত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অবশেষে এলো সেই স্মরণীয় দিন। 1831 খ্রীষ্টাব্দের 27 ডিসেম্বর। ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি ছাড়লো 'এইচ. এম. এস. বিগল' নামের সেই জাহাজ। বিজ্ঞানের

গ্রহের রাজা বৃহস্পতি

বিমান বসু

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ হলো বৃহস্পতি। অতিকায় এই গ্রহটি এত বিশাল যে এর মধ্যে 1300টা পৃথিবী অনায়াসে ধরে যেতে পারে। সৌরমণ্ডলের বাকি আটটি গ্রহ এবং সব কটি উপগ্রহকে যদি একসঙ্গে জড়ো করা যায় তবে তাদের সমষ্টিগত আয়তনও বৃহস্পতির আয়তনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ হবে! আর একা বৃহস্পতির ভর হলো বাকি সব কটি গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টিগত ভরের প্রায় আড়াই গুণ। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আজ পর্যন্ত এর 14টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া গ্রহযান পাঠিয়ে আরও একটা নতুন খবর পাওয়া গেছে। জানতে পারা গেছে যে, শনির মত বৃহস্পতির রিং বা বলয় আছে, যদিও তা খুবই ক্ষীণ।

সূর্য থেকে দূরত্ব হিসেবে বৃহস্পতি হলো পঞ্চম গ্রহ। তবে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তোমরা জানো যে, সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের দূরত্ব হলো 22 কোটি 79 লক্ষ কিলোমিটার। সে তুলনায় বৃহস্পতির দূরত্ব হলো 77 কোটি 90 লক্ষ কিলোমিটার। মানে, মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে প্রায় 55 কোটি কিলোমিটার এলাকায় আর কোনও গ্রহ নেই। ব্যাপারটা বহুকাল থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কেপলার থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে নিশ্চয়ই কোনও গ্রহ আছে যার সন্ধান তারা পান নি। এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো 1772 সালে বিখ্যাত বোডের সূত্র (Bode's Law) প্রকাশিত হওয়ার পর। ঐ সূত্র অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে, সূর্য থেকে প্রায় 42 কোটি কিলোমিটার দূরে আরও একটা গ্রহ থাকা উচিত। আজ অবশ্য আমরা জানতে পেরেছি যে, বোডের সূত্র অনুসারে যেখানে পঞ্চম গ্রহটি থাকার কথা সেখানে কোনও আস্ত গ্রহ নেই, বরং আছে অসংখ্য টুকরো টুকরো বস্তুপিণ্ড, যেগুলো গ্রহের মতই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। হয়তো অতীতে কোনও সময় আস্ত একটি গ্রহই ছিল যা, যে কোনও কারণেই হোক, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আর সে জায়গায় রয়ে গেছে ছোট বড় নানা আকাকের অসংখ্য গ্রহের টুকরো। এরকম একটা কিছু ভেবেই বিজ্ঞানীরা ঐ বস্তুপিণ্ডগুলির নাম দিয়েছেন গ্রহাণুপুঞ্জ বা asteroids। আজ পর্যন্ত প্রায় 2000 গ্রহাণুপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি গ্রহাণু আছে। গ্রহাণুদের কথা পরে আরও বলবো। এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো গ্রহ। সুতরাং বৃহস্পতির কথায় ফিরে আসা যাক্।

আগেই বলেছি বৃহস্পতি হলো এক অতিকায় গ্রহ। এর ব্যাস হলো 1 লক্ষ 42 হাজার আটশো কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবীর ব্যাস 13 হাজার কিলোমিটারেরও কম। কিন্তু আয়তনে বড় হলে কি হবে, বৃহস্পতি খুবই হাল্কা গ্রহ। এর গড় ঘনত্ব হলো পৃথিবীর ঘনত্বের 4 ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেজন্য আয়তনে প্রায় 1300 গুণ বড় হলেও বৃহস্পতির ভর হলো পৃথিবীর তুলনায় মাত্র 318 গুণ বেশি।

এমনটি হওয়ার প্রধান কারণ হলো বৃহস্পতির গঠন। পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র ও বুধ হলো মাটিপাথরের তৈরী গ্রহ। সেজন্য এদের ঘনত্ব বেশি। কিন্তু বৃহস্পতি (এবং শনি) প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের তৈরী। তাই এদের ঘনত্ব খুবই কম।

গত কয়েক বছরে গ্রহযান পাঠিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, বৃহস্পতির ভেতরটা কোনও কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরী নয় এবং গ্রহটির উপরিতল বলতে কিছুই নেই। কেবল কেন্দ্রের কাছাকাছি কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত গ্রহটাই তরল হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন কক্ষপথে একবার পরিক্রমা করতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় 12 বছর। কক্ষপথে চলতে চলতে প্রতি 399 দিন পরে পরে বৃহস্পতি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 59 কোটি 10 লক্ষ কিলোমিটার। এ সময় প্রায় সারা রাত ধরেই বৃহস্পতিকে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় আর দূরবীন দিয়ে দেখার এই হলো সবচেয়ে ভালো সময়। বৃহস্পতি যখন পৃথিবী থেকে সব চেয়ে দূরে চলে যায় তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 96 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার।

বিশালকায় হওয়ার দরুন রাতের আকাশে বৃহস্পতিকে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। তবে যে কোনও শক্তিশালী দূরবীনে তার আসল রূপটা চোখে পড়ে লাল, হলদে, খয়েরী ডোরাকাটা চাকতির মত বৃহস্পতি। ঐ ডোরা দাগগুলি

কিন্তু স্থির নয়, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। ঐ দাগগুলির গতি পর্যবেক্ষণ করেই জানতে পারা যায় যে, বৃহস্পতির নিজের অক্ষে ঘোরার গতি খুবই দ্রুত। অত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে বৃহস্পতির সময় লাগে মাত্র 9 ঘণ্টা 50 মিনিট। আবার ঐ গতিও কিন্তু সব জায়গায় এক নয়। দেখা গেছে যে, বৃহস্পতির মেরু অঞ্চল তার বিষুব অঞ্চলের চেয়ে আস্তে ঘুরছে। সেখানে সময় লাগে প্রায় 9 ঘণ্টা 56 মিনিট। বুঝতেই পারছ, বৃহস্পতির গঠন যদি কঠিন হত, তা হলে এমন হওয়া সম্ভব হত না। তার ভেতরটা তরল অবস্থায় আছে বলেই এটা হতে পারে।

বিশাল ঐ গোলকটির অত দ্রুতবেগে ঘোরার একটা ফল হলো এই যে, অপকেন্দ্র বলের দরুন বৃহস্পতির বিষুবীয় অঞ্চল তার মেরু অঞ্চলের তুলনায় অনেকটা ফোলা। দেখা গেছে, গ্রহটির বিষুবীয় ব্যাস তার ধ্রুবীয় ব্যাসের চেয়ে প্রায় 8800 কিলোমিটার বেশি। এজন্য দূরবীনে বৃহস্পতির চাকতিটিকে পুরো গোলাকার দেখায় না, দেখায় ওপরে-নিচে খানিকটা চাপা উপবৃত্তের মত।

নানা রং-এর ডোরা ছাড়া দূরবীনে বৃহস্পতির যে জিনিসটা সহজেই চোখে পড়ে তা হলো এক বিরাট লাল ছোপ। প্রায় 40,000 কিলোমিটার লম্বা ডিমের মত আকারের গাঢ় লাল রং-এর ছোপটিকে দেখা যায় গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধে 20 ডিগ্রী অক্ষাংশ বরাবর। অবশ্য ছোপটির রং সব সময়ে এক থাকে না। কখনও তাকে গাঢ় লালরং-এর দেখায়, আবার কয়েক বছরের মধ্যে সেটা ফিকে হয়ে হাল্কা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। পরে আবার সেটা লাল হয়ে যায়।

বহুদিন ধরেই বৃহস্পতির লাল ছোপ নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে নানারকম ধারণা ছিল। কেউ মনে করতেন যে, ছোপটি আসলে হলো বৃহস্পতির উপরিতলেরই অংশ যা মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কারো বা ধারণা ছিল যে, ছোপটি হলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলেরই কোনও স্থায়ী অংশ, আবার কেউ ভাবতেন ওটা হলো বৃহস্পতির ঘন বায়ুমণ্ডলের ওপর ভাসমান কোনও বস্তুর স্তর।

সাম্প্রতিককালে পায়োনিয়ার এবং ভয়েজার গ্রহযান থেকে পাঠানো ছবি ও তথ্য অবশ্য এসব ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, লাল ছোপটি আসলে হলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের বিশাল ঘূর্ণীঝড় অধ্যুষিত এলাকা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধের ঐ প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড় শত শত বছর ধরে চলে আসছে আর হয়তো আরও হাজার হাজার বছর ধরে এমনভাবেই চলবে।

1972 সালে বৃহস্পতির উত্তর গোলার্ধেও একটা ছোট লাল ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। 1973 সালে যখন পায়োনিয়ার-10 গ্রহযানটি বৃহস্পতির কাছাকাছি পৌঁছয় তখন ছোপটির ছবিও তোলা হয়। কিন্তু পরের বছর যখন পায়োনিয়ার-11 বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে যায়, তখন আর সে ছোপটিকে দেখতে পাওয়া যায় নি।

বৃহস্পতির গায়ে ছোপের লাল রং হওয়ার একটা ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, ওটা হয় ঘূর্ণীঝড়ের দরুন নিচেকার বায়ুমণ্ডল থেকে ফসফোরাস এবং গন্ধকের যৌগের ওপরের বায়ুমণ্ডলে উঠে আসায়।

বৃহস্পতির বিরাট 'লাল ছোপ' বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে। দুটি উপগ্রহ—আইও (বাঁয়ে) এবং ইউরোপা (মাঝখানে)

আগেই বলেছি যে, বৃহস্পতির উপরিতল বলে কিছুই নেই। দূরবীনে ডোরাকাটা যে দাগ বৃহস্পতির গায়ে দেখতে পাওয়া যায় তা হলো তার বায়ুমণ্ডলে মেঘের বিভিন্ন স্তর, যা বিষুবরেখার সমান্তরালে বিভিন্ন বেগে ঘুরে চলেছে। ঐ মেঘের স্তরেও চোখে পড়ে নানারকম ফুট ফুট দাগ যা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। এত সব অদলবদল ও ওলট-পালোট থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বৃহস্পতির ভেতরকার বায়ুমণ্ডলে সব সময়েই প্রচণ্ড আলোড়ন হয়ে চলেছে আর তারই ফলে বায়ুমণ্ডলের বাইরের চেহারাও ক্রমাগত বদলাচ্ছে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল কত গভীর তা সঠিকভাবে আজও জানতে পারা যায় নি। তবে অনুমান করা হয়, সেটা হয়তো 1000 কিলোমিটারের বেশি নয়। কারণ এর নিচে বায়ুমণ্ডলের চাপ এত বেশী হয়ে পড়ে যে, বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি আর গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না, তরল হয়ে পড়ে। বায়ুমণ্ডলের নিচে থেকে প্রায় কেন্দ্র পর্যন্ত বৃহস্পতির সবটাই তরল হাইড্রোজেন দিয়ে

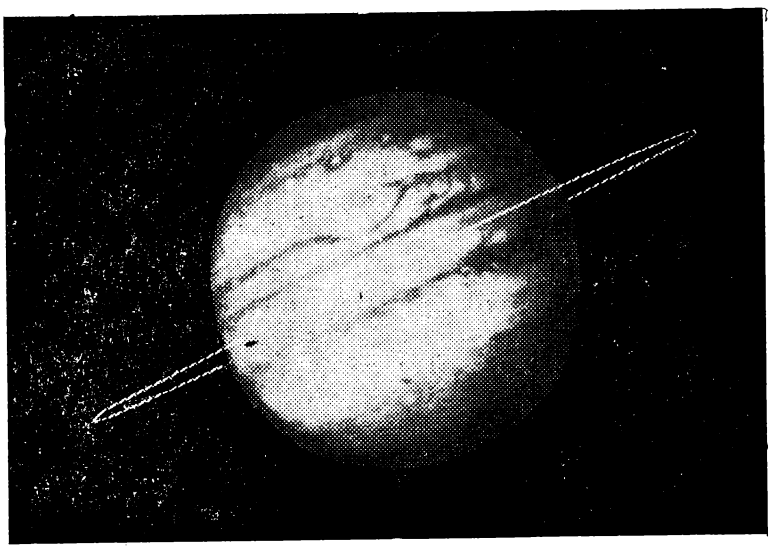

বৃহস্পতির রিং বা বলয়।

তৈরী। অবশ্য বায়ুমণ্ডলের 24,000 কিলোমিটার নিচে প্রচণ্ড চাপের দরুন তরল হাইড্রোজেনে ধাতুর মত গুণ দেখা দেয় এবং তা বিদ্যুৎপরিবাহী হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতির ভেতরের ঐ বিদ্যুৎপরিবাহী অংশই হলো তার তীব্র চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে তিনটি প্রধান স্তর আছে। তরল হাইড্রোজেনের স্তরের ওপরেই যে অংশ সেটা হলো বরফের কণা দিয়ে তৈরী। এই স্তরের ওপরে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের একটা পাতলা স্তর। তার ওপরে আছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড্ কণা দিয়ে তৈরী স্তর। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরটা হলো জমাট অ্যামোনিয়া কণা দিয়ে তৈরী। অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন থাকার দরুন বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল যে দুর্গন্ধময় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন সূর্যের খুব কম তাপই বৃহস্পতি পর্যন্ত পৌঁছয়। সুতরাং এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, বৃহস্পতি খুবই ঠাণ্ডা হবে। কিছুকাল আগে পর্যন্তও সেরকম একটা ধারণাই ছিল। পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পাওয়া যায় শূন্য ডিগ্রীর নিচে 120 ডিগ্রী সেলসিয়স। কিন্তু পরে জানতে পারা গেছে যে, বাইরেটা ঠাণ্ডা হলেও বৃহস্পতির ভেতরটা খুবই গরম। একটা অনুমান হিসেবে বায়ুমণ্ডলের নিচে, 1000 কিলোমিটার গভীরে, তাপমাত্রা প্রায় 2000 ডিগ্রী। 24,000 কিলোমিটার নিচে, যেখানে তরল ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর শুরু হচ্ছে, তাপমাত্রা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় 11,000 ডিগ্রীর কাছাকাছি। বৃহস্পতির কেন্দ্রের তাপমাত্রা 30,000 ডিগ্রীর কাছাকাছি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।

বৃহস্পতির ভেতরে অত বেশী উত্তাপ কোথা থেকে আসছে তা সঠিক জানা নেই। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে, ভেতরের প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলই হলো ঐ উত্তাপের উৎস। দেখা গেছে যে, যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য থেকে বৃহস্পতি গ্রহণ করে তার চেয়েও প্রায় তিন গুণ তাপ সে মহাশূন্যে বিকিরণ করে। এছাড়া, প্রবল চুম্বকীয় ক্ষেত্র থাকার দরুন বৃহস্পতি থেকে প্রচুর রেডিওতরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

আজ পর্যন্ত বৃহস্পতির 14টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে চারটি হলো খুবই বড়, অন্যগুলি

বৃহস্পতির উপগ্রহ

উপগ্রহ সংখ্যা*	নাম	আবিষ্কারের তারিখ	ব্যাস	দূরত্ব	কক্ষপথ পরিক্রমণ সময়
14	—	1979	30-40 কি. মি,	1,25,000 কি. মি.	7 ঘণ্টা 8 মিনিট
5	অ্যামালথিয়া	1892	150 কি. মি.	1,80,900 কি. মি.	11 ঘণ্টা 57 মিনিট
1	আইও	1610	3,640 কি. মি.	4,21,000 কি. মি.	1 দিন 18 ঘণ্টা 27 মিনিট
2	ইউরোপা	1610	3050 কি. মি.	6,71,000 কি. মি.	3 দিন 13 ঘণ্টা 14 মিনিট
3	গ্যানিমীড	1610	5,220 কি. মি.	10,70,400 কি. মি.	7 দিন 3 ঘণ্টা 43 মিনিট
4	ক্যালিস্টো	1610	4190 কি. মি.	18,82,600 কি. মি.	16 দিন 16 ঘণ্টা 32 মিনিট
13	লেডা	1974	—	1,11,15,000 কি. মি.	240 দিন
6	হিমালিয়া	1904	100 কি. মি.	1,14,77,500 কি. মি.	250 দিন 13 ঘণ্টা 35 মি.
10	লিসিথিয়া	1938	20 কি. মি.	1,17,20,200 কি. মি.	259 দিন 5 ঘণ্টা 15 মিনিট
7	এলারা	1905	30 কি. মি.	1,17,36,700 কি.মি.	259 দিন 15ঘণ্টা 40 মিনিট
12	আনাঙ্কে	1951	20 কি. মি.	2,12,43,000 কি.মি.	631 দিন
11	কার্মে	1938	20 কি. মি.	2,25,89,000 কি.মি.	692 দিন
8	প্যাসিপি	1908	20 কি. মি.	2,34,87,000 কি.মি.	744 দিন
9	সিনোপে	1914	20 কি. মি.	2,36,36,000 কি.মি.	758 দিন

*সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে যেমন যেমন উপগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই ক্রমানুসারে। যেমন, প্রথম যে চারটি উপগ্রহের সন্ধান 1610 সালে গ্যালিলিও পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা যথাক্রমে 1,2,3 এবং 4। 1979 সালে আবিষ্কৃত সবশেষ উপগ্রহের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে 14।

যে সব গ্রহযান বৃহস্পতি অভিমুখে পাঠানো হয়েছে

গ্রহযান	যাত্রা শুরু	পৌঁছানোর তারিখ	কি কি করেছে
1. পায়োনিয়ার 10	1 মার্চ 1972	4 ডিসেম্বর 1973	1,31,000 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল ও তার কয়েকটি উপগ্রহের ছবি তুলে পাঠায়।
2. পায়োনিয়ার 11	6 এপ্রিল 1973	3 ডিসেম্বর 1974	বৃহস্পতির 46,400 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে শনিগ্রহের দিকে চলে যায়। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের বিষয় অনেক তথ্য এবং ছবি পাঠায়।
3. ভয়েজার-1	5 সেপ্টেম্বর 1977	5 মার্চ 1979	বৃহস্পতির 2,76,000 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে শনিগ্রহের দিকে চলে যায়। গ্রহ-যান থেকে তোলা ছবিতে বৃহস্পতির বলয়ের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়।
4. ভয়েজার-2	20 আগস্ট* 1977	9 জুলাই 1979	বৃহস্পতির 6,46,000 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন অভিমুখে চলে যায়। গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে বৃহস্পতির 14 নম্বর উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়।

*ভয়েজার 2কে আগে ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে পৌঁছয় ভয়েজার 1-এর পরে।

খুবই ছোট। বৃহস্পতির চারটি বড় উপগ্রহের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় 1610 সালে। বিখ্যাত্ ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে প্রথম এই চারটি উপগ্রহকে দেখেছিলেন। পরে আরও শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার হওয়ার পর অন্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। 14 নম্বর উপগ্রহটির সন্ধান পাওয়া গেছে ভয়েজার গ্রহযান থেকে পাঠানো ছবিতে।

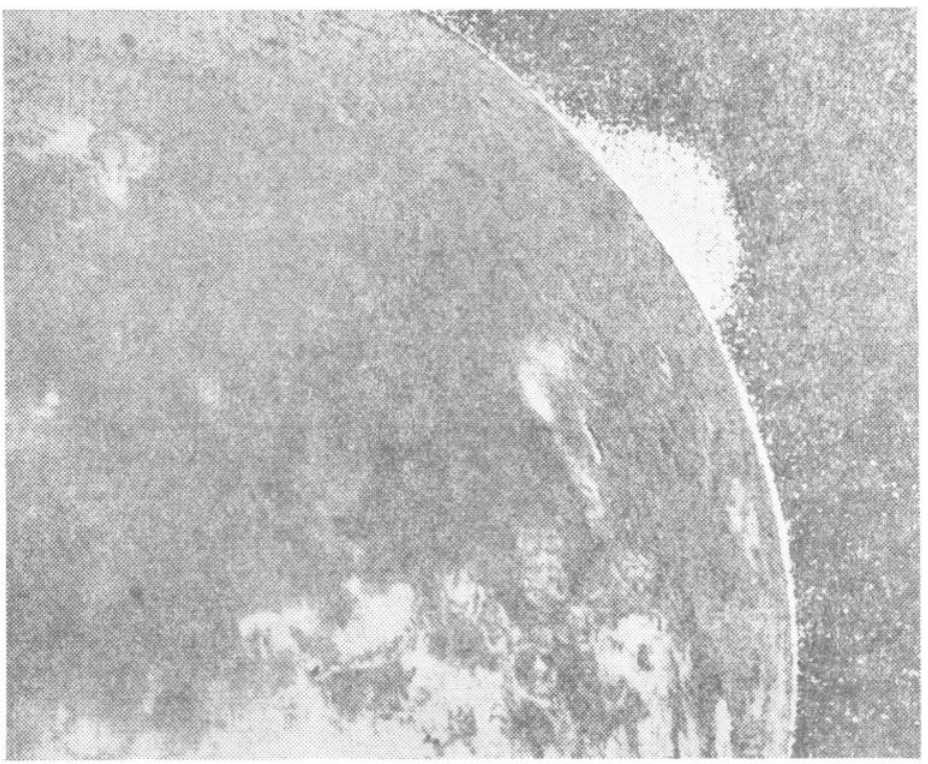

বৃহস্পতির উপগ্রহ 'আইও'র ওপর অগ্ন্যুৎপাত

বৃহস্পতির 14টি উপগ্রহ দেখে মনে হয় তারা যেন তিনটি আলাদা ঝাঁকে গ্রহটিকে পরিক্রমা করছে। 1নং থেকে 5নং পর্যন্ত প্রথম ঝাঁক, এরা রয়েছে মূল গ্রহের সবচেয়ে কাছে প্রায় তার বিষুবতল বরাবর। এদের কক্ষপথ বৃত্তাকার এবং গ্রহের চারদিকে ঘুরতে সময় নেয় 12 ঘণ্টা থেকে 16 দিন পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঝাঁক 6নং, 7নং, 10নং ও 13নং নিয়ে, এরা রয়েছে গ্রহ থেকে বেশ দূরে। দ্বিতীয় ঝাঁকের উপগ্রহগুলির কক্ষপথ উৎকেন্দ্রিক আর সেটি গ্রহের বিষুবতলের সঙ্গে প্রায় 30 ডিগ্রী হেলানো। এই ঝাঁকের উপগ্রহগুলি বৃহস্পতির চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় প্রায় আট মাস।

তৃতীয় ঝাঁকের চারটি উপগ্রহের কক্ষপথও উৎকেন্দ্রিক, তবে সেগুলির দূরত্ব আরও বেশী। এই ঝাঁকের উপগ্রহগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে, এগুলি গ্রহের গতির বিপরীত দিকে চলে। বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এদের সময় লাগে প্রায় দু বছর। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, একেবারে বাইরের ঝাঁকের এই উপগ্রহগুলি আসলে হলো বৃহস্পতির টানে বাঁধা পড়া গ্রহাণু। এরকম হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ এই উপগ্রহগুলির কোনওটারই ব্যাস 30 কিলোমিটারের বেশি নয়।

বৃহস্পতির বড়ো চারটি উপগ্রহ—আইও (Io), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমীড্ (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto) সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য ভয়েজার গ্রহযানগুলি থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়া আরও জানতে পারা গেছে যে, বৃহস্পতির চারপাশেও শনির মত রিং বা বলয় আছে, যদিও তা খুবই ক্ষীণ।

ভয়েজার থেকে পাওয়া সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হলো উপগ্রহ আইওর ওপর সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সন্ধান। এর আগে পৃথিবীর বাইরে সৌরমণ্ডলে অন্য কোথাও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে বলে জানা ছিল না। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং আমাদের চাঁদেও অনেক আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি সবকটিই এখন মৃত। আইওর অগ্ন্যুৎগিরণ দেখে মনে হয়, উপগ্রহটি গন্ধকজাত বস্তু দিয়ে তৈরী। আবার অন্য আর একটি উপগ্রহ ইউরোপা প্রায় সবটাই মসৃণ বরফে ঢাকা।

ক্যালিস্টো এবং গ্যানিমীডের বেলায় দেখা গেছে, উপগ্রহ দুটির উপরিতলই অসংখ্য গর্তে ভরা।

বৃহস্পতি সম্বন্ধে গত কয়েক বছরে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এখনও অনেক কিছু অজানা আছে। যেমন ধরো, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের তলায় কি আছে তার সঠিক রূপ আমরা আজও জানি না, যদিও তার একটা আভাস বিজ্ঞানীরা আমাদের দিয়েছেন। আবার বৃহস্পতি বুকে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের উৎস কোথায় তাও আমাদের জানা নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা পাবো আর তিন চার বছর পরে যখন 'গ্যালিলিও' নামক গ্রহযান বৃহস্পতি অভিমুখে পাঠানো হবে। গ্রহটির কাছে পৌঁছবার পর গ্যালিলিও থেকে একটি অবতরণযান বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল ভেদ করে নামানো হবে। মূল গ্রহযানটিকে সেসময় বৃহস্পতির কক্ষে স্থাপন করা হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পরিকল্পনা সফল হলে বৃহস্পতি সম্বন্ধে অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর মিলবে। গ্রহের রাজার আসল রূপ হয়তো তখনই আমরা জানতে পারব।

(ক্রমশঃ)

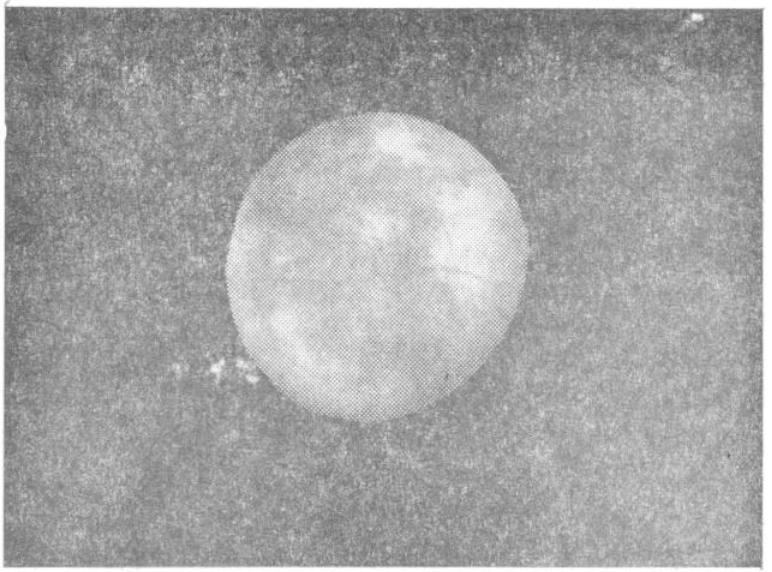

বৃহস্পতির উপগ্রহ 'ইউরোপা'

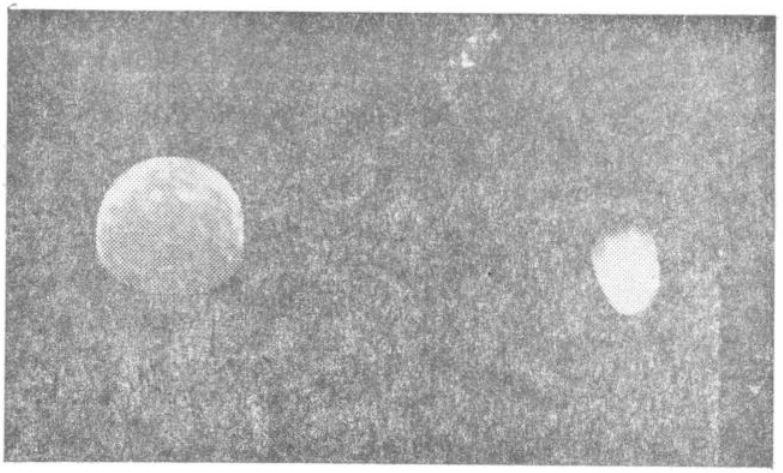

বৃহস্পতির উপগ্রহ 'অ্যামালথিয়া' (বাঁয়ে) এবং 'ক্যালিস্টো (ডাইনে)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনটি চিত্রিত বই,
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ ৮·০০
ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায়ের
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫·০০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·০০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

সহজ কথায় রসায়ন ঃ [দুই]

নিষ্প্রাণ বায়ু ঃ নাইট্রোজেন

অমরনাথ রায়

বাতাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে গ্যাসটি আছে, তার নাম নাইট্রোজেন। মৌলের পর্যায়সারণীর V-B শ্রেণীতে এর অবস্থান। 1772 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। তিনি কিন্তু এর প্রকৃত পরিচয় দিয়ে যেতে পারেন নি। সেটা পেরেছিলেন ফরাসী রসায়নবিদ অ্যাণ্টোয়াইন লরেণ্ট ল্যাভয়সিয়ে। 1775 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাভয়সিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে, নাইট্রোজেন একটি মৌলিক গ্যাস। আরও পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেন যে, এই গ্যাসে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। ল্যাভয়সিয়ে তাই এই গ্যাসটির নাম দেন 'অ্যাজোট' অর্থাৎ 'নিষ্প্রাণ বায়ু'। তখনও পর্যন্ত 'অ্যাজোট' নামেই গ্যাসটি পরিচিত ছিল। নাইট্রোজেন নামটি আসে আরও পরে, 1790 খ্রীষ্টাব্দে। ফরাসী বিজ্ঞানী চ্যাপটাল পটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোরা থেকে নাইট্রোজেন প্রস্তুত ক'রে 'অ্যাজোট' নামটির বদলে 'নাইট্রোজেন' নামটি রাখেন।

মুক্ত নাইট্রোজেনের প্রধান ভাঁড়ার হলো বায়ু। বায়ুর পাঁচ ভাগ আয়তনের মধ্যে চার ভাগই হলো নাইট্রোজেন। কয়লার খনি এবং আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যেও কিছু পরিমাণ মুক্ত নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রকৃতিতে যৌগ হিসাবে সোরা (পটাসিয়াম নাইট্রেট), চিলি সল্টপিটার ($NaNO_3$) এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের প্রোটিনে নাইট্রোজেন যৌগ অবস্থায় থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো নাইট্রোজেনকে 'নিষ্প্রাণ বায়ু' বলা হয় কেন? উত্তর হবে, এই গ্যাসে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না বলে। কিন্তু কেন বাঁচতে পারে না? কারণ নাইট্রোজেন গ্যাস শ্বাসপ্রশ্বাসের সহায়ক নয়। অনেকের ধারণা· গ্যাসটি বুঝি বিষাক্ত; কিন্তু তা মোটেই নয়। সে যাই হোক, বাতাসের নাইট্রোজেন কিন্তু অনেক কাজে লাগে। অ্যামোনিয়া ও নাইট্রিক অ্যাসিডের পণ্যোৎপাদনে নাইট্রোজেন লাগে প্রচুর পরিমাণে। নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদন করা হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার। তরল নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় হিমায়করূপে। নানারকম বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করতেও এই গ্যাসটির প্রয়োজন হয়।

আবার অনেক বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসাবে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে ও গ্যাস থার্মোমিটারেও নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় না হলেও সাধারণভাবে একে নিষ্ক্রিয় বলা হয়, কারণ গ্যাসটি সাধারণ উষ্ণতায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে সচরাচর বিক্রিয়া করে না। তবে হ্যাঁ, উচ্চ উষ্ণতায় এই গ্যাসটির সক্রিয়তা বাড়ে।

বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন নাইট্রোজেন গ্যাস বাতাসের চেয়ে সামান্য হালকা, জলে খুব সামান্য পরিমাণেই দ্রবীভূত হয়। গ্যাসটিতে বেশি চাপ দিয়ে ও ঠাণ্ডা করে প্রথমে তরলে ও পরে কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। এ গ্যাসটি নিজে জ্বলে না বা কোন পদার্থের দহনে সাহায্য করে না। জ্বলন্ত একটি পাটকাঠি নাইট্রোজেনভর্তি গ্যাসজারে প্রবেশ করালে দেখবে যে, পাটকাঠিটি তখনই নিভে যাবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে নাইট্রোজেন-ভর্তি গ্যাসজারে প্রবেশ করালে তা কিন্তু জ্বলতেই থাকে। ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ায় সেক্ষেত্রে একটি সাদা অবশেষ পাওয়া যায়। সেই সাদা অবশিষ্টটি হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড যৌগের। বিক্রিয়াটি সমীকরণ দিয়ে এইভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ $3Mg + N_2 = Mg_3N_2$.

ঐ সাদা অবশেষকে যদি জলের সঙ্গে ফোটাও তা হলে কিন্তু অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ পাবে। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ দুই পদার্থের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও অ্যামোনিয়াম গ্যাস। বিক্রিয়ার সমীকরণ এই রকম ঃ

$$Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 + 2NH_3 \uparrow$$

তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে প্রায় তিন হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের

সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ঘটিয়ে উৎপন্ন করে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস।

$$N_2 + O_2 = 2NO$$

ক্যালসিয়াম কার্বাইডের (CaC_2) নাম শুনেছ তো? যে যৌগটির সঙ্গে সাধারণ উষ্ণতায় জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস, তারই নাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড। এখন যদি তুমি ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে নাইট্রোজেন গ্যাসের সংস্পর্শে প্রায় 1100 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত কর, তা হলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাইট্রোজেন গ্যাসকে শুষে নিয়ে উৎপন্ন করবে একটি যৌগ—যার নাম ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড বা নাইট্রোলিন'।

$$CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$$

নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে হ্যাবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার পণ্যোৎপাদন করা হয়। এজন্যে লোহার সূক্ষ্ম গুঁড়োকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে অতিরিক্ত বায়ুচাপে (200 বায়ুমণ্ডলীর চাপে) এবং প্রায় 550 ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক আয়তন নাইট্রোজেন ও তিন আয়তন হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়। $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

নাইট্রোজেন অণু দ্বি-পরমাণুক। তার মানে, এর একটি অণুতে 2টি পরমাণু বর্তমান। তাই এর আণবিক সংকেত N_2. খুব অল্প চাপে (প্রায় 2 মিলিমিটার) নাইট্রোজেনের গ্যাস রেখে তার মধ্যে তড়িৎক্ষরণ ঘটালে ঐ গ্যাস থেকে মৃদু আলোর বিকিরণ ঘটতে দেখা যায়। তড়িৎক্ষরণ বন্ধ হলেও গ্যাসটি থেকে আলোক বিকিরণ হয়ে থাকে। এই নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সাধারণ নাইট্রোজেনের চাইতে অনেক বেশি। তাই একে 'সক্রিয় নাইট্রোজেন' আখ্যা দেওয়া হয়।

রসায়নাগারে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটকে চাপ দিয়ে বিয়োজিত করে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করা হয়। তবে কেবলমাত্র অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের তাপ বিয়োজন ঘটালে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। বিক্রিয়ার গতিকে মন্থরতর করবার জন্যে তাই সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণের মিশ্রণকে সাবধানে ধীরে গরম করা হয়। এর ফলে বিপরিবর্ত বিক্রিয়ার দরুন প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হয়। তারপর সেই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেইটের তাপ বিয়োজন ঘটে। উৎপন্ন হয় জল আর নাইট্রোজেন। বিক্রিয়ার সমীকরণ এইরকম ঃ—

$$NaNO_2 + NH_4Cl = NaCl + NH_4NO_2$$
$$NH_4NO_2 = 2H_2O + N_2 \uparrow$$

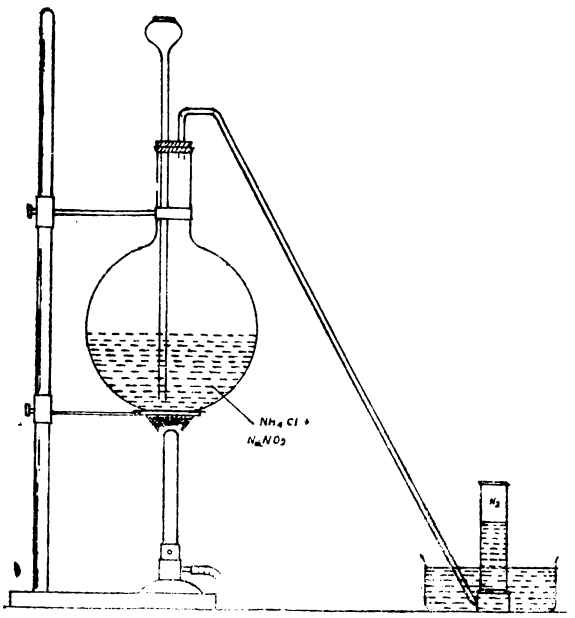

নাইট্রোজেন গ্যাস বেরুতে শুরু করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ঐ সময়ের মধ্যে ফ্লাস্কের বাতাস বেরিয়ে যায়। তারপর একটি জলভর্তি গ্যাসজারকে নির্গম নলের শেষ প্রান্তের ওপর উপুড় করে বসিয়ে দিতে হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস তখন জলকে নিচের দিকে সরিয়ে গ্যাসজারে জমা হয়।

এই পরীক্ষাটি কিন্তু খুব সাবধানে করা দরকার। বিশেষ করে বিক্রিয়া ঘটে যে ফ্লাকে, সেটিকে খুব সাবধানে গরম করতে হয়। উত্তাপ বেশি হয়ে গেলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এই পরীক্ষার সময় গ্যাস বেরুতে শুরু করলেই তাপ দেওয়া বন্ধ করতে হয়। আবার বিক্রিয়া দ্রুত গতিতে ঘটতে থাকলে ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা করতে হয়।

এইভাবে যে নাইট্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায় তা কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও এই গ্যাস সংগ্রহ করে তোমরা নাইট্রোজেনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি যাচাই করে নিতে পার।

আরও কয়েকটি উপায়ে এই গ্যাসকে রসায়নাগারে তৈরি করা যায়। তবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই সব পদ্ধতির উপযোগিতা কম। তবুও এই সব পদ্ধতির

মধ্যে একটির কথা জেনে রাখা ভাল। তোমরা ব্লিচিং পাউডারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। ব্লিচিং পাউডারের সংকেত হলো $Ca(OCl)Cl$. এই যৌগটির সাহায্যে অ্যামোনিয়াকে জারিত ক'রে নাইট্রোজেন গ্যাস নিচের বিক্রিয়া অনুযায়ী প্রস্তুত করা যায়।

$$2NH_3 + 3Ca(OCl)Cl = 3CaCl_2 + 3H_2O + N_2 \uparrow$$

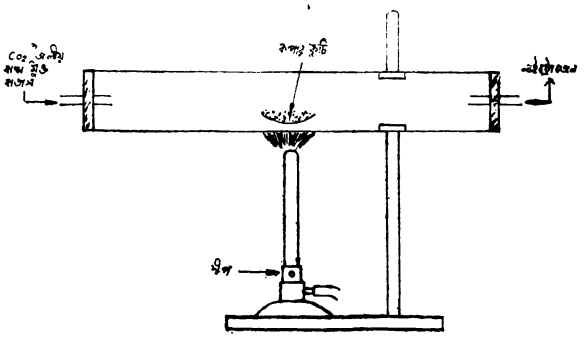

আগেই বলেছি যে, বাতাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। বাতাস থেকেও নাইট্রোজেনকে উদ্ধার করা যেতে পারে। এজন্যে বাতাসকে প্রথমে কস্টিক পটাশ (KOH) দ্রবণের মধ্যে দিয়ে চালনা করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) দূর করে নিতে হয়। তারপর ফসফরাস পেণ্টক্সাইডের (P_2O_5) মধ্যে দিয়ে চালনা ক'রে বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প দূর করতে হয়। সবশেষে সেই বাতাসকে দহন নলের মধ্যে রাখা উত্তপ্ত কপার কুচির উপর দিয়ে চালনা করলেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে কপার যুক্ত হ'য়ে কিউপ্রিক অক্সাইড্ (CuO) গঠন করে। নির্গম নলের মধ্যে নিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে।

বাতাস থেকে উদ্ধার করা এই নাইট্রোজেনও কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। কারণ বাতাসের মধ্যেকার হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিকে পৃথক করা সহজ নয়। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি সামান্য পরিমাণে থেকে যাওয়ার জন্যে বাতাস থেকে উদ্ধার করা নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন রসায়নাগারে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট থেকে প্রস্তুতকরা নাইট্রোজেনের ওজনের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি হয়।

তরল বাতাসের আংশিক পাতনের দ্বারাও নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা যায়। তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাংক—183°C এবং তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাংক—195°C. তরল বাতাসে প্রায় 25% নাইট্রোজেন ও 50% অক্সিজেন তরল অবস্থায় থাকে। তরল অক্সিজেনের চেয়ে তরল নাইট্রোজেন বেশি উদ্বায়ী। সেজন্য তরল বাতাসকে আংশিক পাতিত করলে আগে নাইট্রোজেন পাতিত হ'য়ে আসে।

নিষ্প্রাণ বায়ু নাইট্রোজেনের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া হলো। এবারে নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা কর দেখি।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. নাইট্রোজেন সম্বন্ধে নিচের কোন্ উক্তিটি সত্য নয় ?
(ক) গ্যাসটি স্বচ্ছ চুন জলকে ঘোলা করে না। (খ) গ্যাসটির গন্ধ নেই। (গ) গ্যাসটি অধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। (ঘ) গ্যাসটি কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

2. নিচের কোন্ বিক্রিয়াটি ঘটে না ?
(ক) $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ (খ) $CuO + N_2 \rightarrow Cu + N_2O$ (গ) $3Ca + N_2 \rightarrow Ca_3N_2$ (ঘ) $3Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

3. নিচের কোন্ বিক্রিয়াটিতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় না ? (ক) অ্যামোনিয়া ও উত্তপ্ত কপার।
(খ) অ্যামোনিয়া ও উত্তপ্ত কপার অক্সাইড।

4. 'নাইট্রোলিম কি ? কিভাবে এটি উৎপন্ন হয়।

5. নাইট্রোজেনের সক্রিয়তা বাড়ানো যায় কোন্ উপায়ে ?

6. মৌলের পর্যায়সারণীর কোন্ শ্রেণীতে নাইট্রোজেনের অবস্থান ? (ক) I ; (খ) II-B ; (গ) V-B ;

7. কোন্ কোন্ উপায়ে নাইট্রোজেন গ্যাসকে সনাক্ত করা যায় ?

8. কোন্ কোন্ কাজে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয় ?

9. তরল বাতাস থেকে কিভাবে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা যায় ?

10. নাইট্রোজেনের যৌগ থেকে প্রস্তুত নাইট্রোজেন, বায়ু থেকে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের চেয়ে ওজনে কম হয় কেন ?

11. নাইট্রোজনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে হলে কি কি শর্তের প্রয়োজন ?

12. পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেনের যৌগ থেকে নাইট্রোজেন প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

13. নাইট্রোজেন গ্যাসের 'অ্যাজোট' নাম রাখেন কে ? 'অ্যাজোট' কথার অর্থ কি ?

14. নাইট্রোজেন গ্যাস নিম্নোক্ত কোন্ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন ? (ক) ক্যাভেণ্ডিশ (খ) ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড (গ) ল্যাভয়াসিয়ে। (ঘ) রবার্ট বয়েল

মাছরাঙা পাখিদের কথা

অজয় হোম

পাখি দেখতে বা লক্ষ্য করতে বেরিয়েছি। সেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বরের দিকে চলেছি রেলের লাইন ধরে, রাস্তা দিয়ে নয়। দিয়ারা পার হয়ে নসিবপুরের দিকে যেতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের তারের উপর একটি পাখির দিকে নজর পড়ল। মোটা লম্বা লাল চঞ্চু; বুকটা সাদা। স্যুটপরা কোটের বোতাম লাগানো লোকের শুধু গলা ও বুকে সাদা সার্টটা যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন। ওই সাদাকে ঘিরে আছে বাদামী লাল রঙ। পাখিটাকে মাছখেকো বলেই জানি এবং পুকুরপাড়ে গাছের উপরও দেখেছি। বংশের ধারায় মাছই প্রধান খাদ্য বলে জানি। কিন্তু ধারেকাছে পুকুর নেই, তেমন কিছু জলের জায়গাও দেখছি না, অথচ বসে আছে নীলকণ্ঠ পাখির মতো টেলিগ্রাফের তারে। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে থাকি।

পাখিটা থেকে থেকে ঝুলন্ত লেজটাকে দোলাচ্ছে। সেই ছন্দে মাথাটাকেও উপরনিচ সামনে পেছনে করছে।... দোলানি বন্ধ করেছে। দেখি স্থির হয়ে মুখটাকে নিচু করে মাটির দিকে কি যেন দেখছে। খানিক বাদেই ঝপ্ করে মাটিতে নেমে এসে ধরলো একটা বড়ো গোছের ঘাসফড়িং। ধরেই উড়ে গিয়ে বসলো কাছেই একটা গাছে।

দেখলাম স্বভাবে নীলকণ্ঠ পাখির সঙ্গে খুবই মিল। বংশগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে ফড়িং খাচ্ছে দেখে প্রথমটা খুবই অবাক লেগেছে। তারপর মনে পড়লো, আরে! এ তো নীলকণ্ঠ-বর্গের পাখি, গোত্রের স্বভাব তো কিছু থাকবেই।

ঘাসফড়িং খেতে দেখলাম যে পাখিকে সে হল মৎস্য-রঙ্গ বংশের অন্তর্গত কিকীদিবি গণের (হালসিওন) এক প্রজাতি; নাম—সাদাবুক মাছরাঙা (হালসিওন স্মাইরেনসিস্)। হিন্দী—কিলকিলা, কোড়িলা। ইংরেজি—হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার। ভারতে 4টি প্রজাতি।

সাদাবুক মাছরাঙা লম্বায় 11 ইঞ্চি। মাথা ঘাড় এবং পেট গাঢ় বাদামী-পাটকিলে। চিবুক গলা ও বুকের মাঝ বরাবর ধবধবে সাদা। বাকি উপরের পালক গাঢ় উজ্জ্বল নীল, তার উপর সবুজের আভা। একটা কালচে পট্টি ডানার পাশে। ওড়ার পালক কালো, গোড়ার দিকের উপর সাদা ছোপ। কনীনিকা পাটকিলে; লম্বা ভারী সূঁচালো চঞ্চু গাঢ় নিষ্প্রভ লাল; পা প্রবাল-লাল, নখর ধূসর। পায়ের দ্বিতীয় তৃতীয় আঙুল অংশত জোড়া।

সাদাবুক মাছরাঙা

বাসস্থান—মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইন্দোচীন, হাইনান দ্বীপ, ফরমোজা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে 4টি উপজাতি। প্রথম (হা স্মা পেরপান্দ্রা)—পূর্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে অন্ধ্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে, 6 হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় (হা স্মা স্মাইরেনসিস্) —পাকিস্তান থেকে উত্তরপশ্চিম ভারতের কাছে, সৌরাষ্ট্র, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল; দক্ষিণে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রে। তৃতীয় (হা স্মা ফুসকা)—মহীশূর, গোয়া, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায়। চতুর্থ (হা স্মা সাট্যুরাটিওর)—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য—মাছ প্রধান তালিকায় পড়ে না। ঘাসফড়িং, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে, উই ইত্যাদি কীট-পতঙ্গ, কাঁকড়াবিছে তেঁতুলেবিছে কেন্নো, কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, টিকটিকি-গিরগিটি, ইঁদুর এবং ছোটখাটো অসুস্থ দুর্বল ও ছানা পাখি।

স্বভাব—সাদাবুক মাছরাঙা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের ধারে থেকে কেবল মাছ মেরেই খায় না। এদের খাদ্যতালিকায় মাছটা গৌণ। এমনকি উড়ন্ত অবস্থাতেও কীটপতঙ্গ ধরে থাকে। অবশ্য মাছও মাঝে মাঝে ধরে অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের মধ্যে পড়ে। কাঁকড়া জলের মধ্যে পেলে ছাড়ে না। ডাঙ্গায় এনে ঠুকে ঠুকে থেঁতো করে গিলে খায়।

সাদাবুক মাছরাঙাকে মানুষের বাসস্থানের কাছে অথবা দূরে একা বা জোড়ায় দেখা যায় জলে-ডোবা ধানখেত, পুকুর, ডোবা বা কাঁচা কুয়োর আশেপাশে এবং সমুদ্রের বালুতীরে। আর দেখা যায় জল থেকে অনেক দূরে জঙ্গল ঘেঁষে অথবা অন্যান্য স্থানে পোকামাকড় বা ছোট-খাটো সরীসৃপ ইত্যাদি ধরে খেতে।

প্রত্যেকটি সাদাবুকের খাদ্যসংগ্রহের নিজস্ব এলাকা থাকে। সেখানে অপর কোনও মাছরাঙার একদম প্রবেশাধিকার নেই। কোনও রকম চেষ্টা করা সেখানে চলে না। নিজ এলাকা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

ডাক কর্কশ 'ক্যা...ক্যা...ক্যা' খানিকটা ভূতুড়ে হাসির মতো। কিন্তু প্রজননকালে সাধারণত প্রতিটি সকালে তার পছন্দ মতো গাছের মাথায় বসে, যেখান থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। পুরুষ-পাখি সেখানে ব'সে গান গায় মিষ্টি করে—'কিলিলিলি...'। বারবার একই গান গায়। প্রায়ই দেখা যায় তার অল্প কিছু দূরে বসে আর-একটি অমন পুরুষ অমন সুরে গেয়ে চলেছে। কিলিলিলি চালাবার পর একটা 'ফ্যাঁচ' করে আওয়াজ করে, তারপর আবার শুরু করে গান। গাইবার সময় নিজেকে টান করে বসে, লেজটাকে যে সরু ডালে বসেছে তার তলায় যতদূর যায় বেঁকিয়ে রাখে আর দু-এক সেকেণ্ডের জন্য দুই ডানা ঈষৎ ফাঁক করে কাঁপাতে থাকে। এই সময় ডানার উপর সাদা ছোপটাকে দেখাতে থাকে, যদি কোনও স্ত্রী-পাখি তার সৌন্দর্যে এবং সংগীতে আকৃষ্ট হয়। মিলিত হবার জন্যে স্ত্রী পাখি একটু দূরত্ব রেখে এসে দুই ডানা ফাঁক করে কাঁপায় আর মুখে আওয়াজ করে 'কিট-কিট-কিট কিট...' অর্থাৎ আমি এসেছি। এই ডাক বা আওয়াজটার সঙ্গে বিরক্ত-হওয়া কালো বুলবুলের আওয়াজের সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাদাবুক মাছরাঙার প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে আগস্ট, তবে মার্চ থেকে জুলাই প্রশস্ত সময়। বাসা বানায় শুকনো নালার খাড়া পাড়ে, রাস্তা বানাবার জন্যে খাড়া পাড়ের গায়ে, খানা বা খোঁদলের পাশে অথবা কাঁচা কুয়োর ভিতর সুড়ঙ্গ করে। সুড়ঙ্গ-মুখের ব্যাস প্রায় 3 ইঞ্চি, লম্বায় 6-7 ফুট, সুড়ঙ্গ শেষে ডিমঘর 8-9 ইঞ্চি চওড়া। ডিমঘরে কোনও আস্তরণ নেই, কিন্তু দুর্গন্ধময় কাঁটাকোঁটা ও উদগারে পূর্ণ। ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে ধবধবে সাদা প্রায় গোলাকার শক্ত খোলার। বাসা বানানো থেকে সন্তানপালনের সব দায়িত্ব স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে পালন করে। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·15, চওড়ায় 1·05 ইঞ্চি।

অন্যান্য মাছরাঙা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকচক্ষুতে খুব কম পড়লেও আরও কয়েকটি মাছরাঙাকে দেখা যায়। তারা হল—

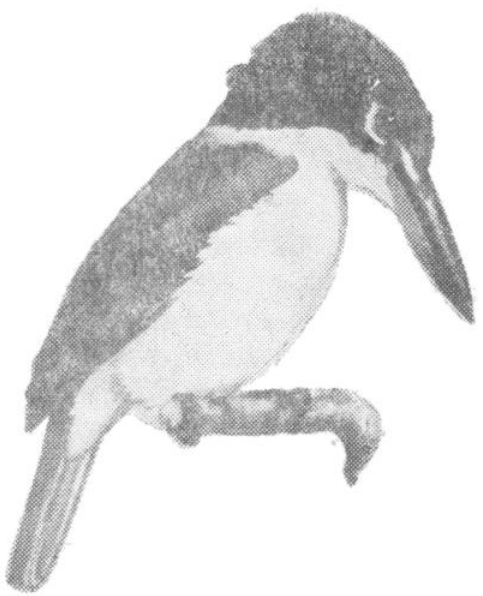

কণ্ঠী মাছরাঙা

1 **কণ্ঠী মাছরাঙা** (হালসিও ক্লোরিস)। বাংলা হিন্দী কোনো নামকরণ কখনও হয় নি। ইংরেজি—হোয়াইট কলার্ড কিংফিশার। কিকীদিবি গণের (হালসিওন) দ্বিতীয় প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে 9 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। মাথা ঘাড় ও উপরের সব পালক সবুজাভ আকাশী-নীল, চিবুক ও গলার মাঝে সাদা কণ্ঠী। এক চোখ থেকে অপর চোখে মাথা ঘুরে কালো এক পট্টি। চোখের ঠিক নিচে সাদা ছোপ। গলার তলা থেকে বাকি তলার পালক সাদা। চঞ্চু কালো।

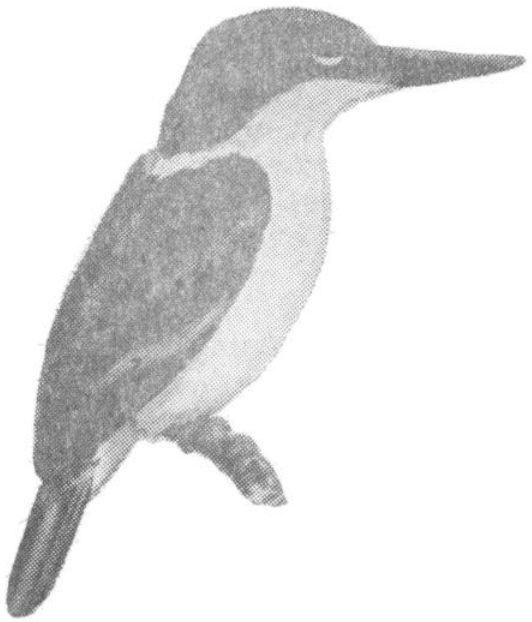

কালোমাথা মাছরাঙা

বাসস্থান—ভারতে 4টি উপজাতি। প্রথম (হা ক্লো হিউমিআই)—সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী স্থান-সমূহ ও 24 পরগনার কিছু অংশে ও বাংলাদেশে। দ্বিতীয় (হা ক্লো ভিডালি)—মহারাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্তী রত্নাগিরি জেলায়। তৃতীয় (হা ক্লো ডেভিডসনি)—আন্দামান ও কোকো দ্বীপপুঞ্জে। চতুর্থ (হা ক্লো অর্কাসিপিটালিস)—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য কাঁকড়া, মনুমাছ (মাড়স্কিপার, পেরিওফ্থালমাস), ঘাসফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা, গিরগিটি, বিছে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ।

স্বভাব—সাদাবুক মাছরাঙার মতন। জেলেদের মাছ-ধরার পর জাল ছাড়াবার সময় এদের ধারে কাছে উড়তে দেখা যায়। ডাক দেয় কর্কশ—'ক্রেরক্-ক্রেরক্-ক্রেরক্ ক্রেরক্'। প্রজননকালে ডাকাডাকিটা বেশি করে। পরস্পরের পিছনে তাড়া করে বেড়ায় এগাছ থেকে সেগাছে আর মুখে এই কর্কশ ডাক দেয়।

মাঝে মাঝে কলকাতার শিবপুরে বটানিক্যাল গার্ডেনে এদের দেখা যায়। 1967 সালে স্বর্গত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত ও লেখক বড়ো বটগাছটার কাছে ঝিলের ধারে গাছের ফোকরে এদের বাসা করতে দেখেছেন। সুন্দরবনে এদের দেখা যায় বেশ। কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় কচুবেড়িয়া, সেখান থেকে বাসে 19 মাইল বেগুয়াখালি বা গঙ্গাসাগরে গিয়েছি ঝড় এবং স্টিমার উল্টে যাবার কিছু পরে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে। পৌঁছেছি সন্ধ্যে-বেলায়। পরের দিন 24 জানুয়ারি 1969 সকাল-বেলায় কপিলমুনির আশ্রম সাগরসঙ্গম দেখতে বেরিয়েছি কজনে।[1] পথে ডানপাশে রাস্তা থেকে নেমে হেঁতালঝোপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ঝড়ে চাল উড়ে-যাওয়া ভেঙেপড়া মাটির দেওয়ালের এক অংশ। সেই দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আছে উপরে নিচে দুটি বাঁশের খণ্ড। উপরেরটায় বসে আছে কণ্ঠী মাছরাঙা। ঠিক নিচের বাঁশে বসেছিল অপর একটি মাছরাঙা যার আলোচনা এরপরেই করব। এত কাছে এই দুই প্রজাতির দেখা পাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। সকালের আলোয় এদের নীলের বাহার ছিল দেখবার মতো।

প্রজননকাল ম্যর্চ থেকে আগস্ট। গাছের গায়ে ফোকরে, গেছো পিঁপড়ের মেটে বাসার ভিতর, কখনও বা উইঢিপির ভিতর বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 3-4টি প্রায় গোলাকার সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 0·11, চওড়ায় 0·09 ইঞ্চি।

2. **কালোমাথা মাছরাঙা** (হা পাইলেয়াটা)। বাংলা নামকরণ হয় নি হিন্দী—আব্লক টেঙিক, কৌড়িলা (সাধারণত সব মাছরাঙারই এই নাম)। ইংরেজি—ব্ল্যাক ক্যাপড্ কিংফিশার। কিকীদিবি গণের তৃতীয় প্রজাতি। একেই দেখেছিলাম কণ্ঠী মাছরাঙার সঙ্গে।

লম্বায় 12 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার চাঁদি ভেলভেট কালো, ঘাড়ে সাদা কলার, বাকি উপরের পালক উজ্জ্বল বেগুনি নীল, কেবল ডানায় সাদা ছোপ। নিচের সমস্ত পালক ফিকে লালচে-হলুদ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু প্রবাল-লাল, পা ও আঙুল গাঢ় লাল।

বাসস্থান—সমুদ্রতীরবর্তী স্থান বোম্বাই থেকে পশ্চিমঘাট ধরে দক্ষিণে, পুবে পূর্বঘাট ধরে সুন্দরবন পর্যন্ত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। সমুদ্রের ধার, খাঁড়ি ইত্যাদি ছাড়াও বড়ো বড়ো নদী ও তার উপনদীর তীর ধরে উত্তরপ্রদেশ (বিশেষত গোন্দা জেলায়), বিহারের মুঙ্গের, মধুবাণী, ত্রিহুত, অন্ধ্র, রাজস্থানের ভরতপুর, আসামের উত্তর লখিমপুর, নাগা পর্বত এবং মণিপুরের উত্তরাংশে।

খাদ্য—প্রধানত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া; কীটপতঙ্গ, টিকটিকি-গিরগিটি এবং ছোটো প্রাণী।

---

1. সর্বশ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সন্তোষকুমার অধিকারী ও দেবকুমার বসু।

স্বভাব—প্রায় সাদাবুক মাছরাঙার মতন। কর্কশ ডাক 'ক্যা-ক্যা' অনেকটা সাদাবুকের মতো হলেও আওয়াজের জোর কম, একটু তীক্ষ্ণ। সাধারণত ওড়ে নিঃশব্দে। একাই বিচরণ করে। নিজ এলাকার শিকার-ভূমির মধ্যে কয়েকটা বিশেষ খুঁটি বা ডাঙা থাকে। সেগুলিতেই দিনের পর দিন এসে বসে।

প্রজননকাল মে থেকে জুলাই। জঙ্গলের মধ্যে নদীর খাড়া পাড়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4-5টি প্রায় গোলাকার সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·26, চওড়ায় 1·03 ইঞ্চি।

3. **লাল মাছরাঙা** (হা কোরোমাণ্ডা)। বাংলা-হিন্দী নামকরণ হয় নি। কাছাড়ি—দাও-নাটু-গাজাও। ইংরেজি—রাডি কিংফিশার। কিকীদিবি গণের চতুর্থ প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে 10 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা, ঘাড়, পিঠের উপরের অংশ ফিকে লালচে-বাদামী। পিঠের মাঝখান থেকে বস্তিপ্রদেশ ফিকে নীলচে-বেগুনি, বস্তিপ্রদেশ সাদা। নিচের সব পালক ফিকে লালচে। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু ও পা উজ্জ্বল লাল।

বাসস্থান—নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য—মাছ, কাঁকড়া, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ, ছোটখাটো প্রাণী।

স্বভাব—লাল মাছরাঙা স্বভাবত লাজুক। প্রধানত উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বাসিন্দা। জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায় দ্রুত লাল পাখি উড়ে যেতে। দেখার চেয়ে এদের ডাক শোনা যায় বেশি। ডাকে সাদাবুকের মতন, তবে অনেক জোর, কিন্তু কর্কশ নয় মোটামুটি মিঠে।

আসামে উত্তর কাছাড়ের জাতিঙ্গা গ্রামের যে পাখির জহরব্রতর কথা জানা যায়, সেই সব পাখির মধ্যে লাল মাছরাঙাই প্রধান। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন কালো রাতে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাওয়া বইলে এই ঘটনা ঘটে। শুধু জাতিঙ্গায় নয়, আরও অনেক স্থানে জঙ্গলের মধ্যে বাংলার পেট্রম্যাসেকর আলো দেখে এবং প্রায়ই লাইটহাউস ও আলোকময় জাহাজে বিশেষত মালাক্কা প্রণালীতে[২] অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেন যে আলো বা আগুন দেখে এরা আকৃষ্ট হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও স্থির হয় নি। কারো মতে ঘন বর্ষার রাতে এরা পরিযায়ী হয় এবং আলো দেখে দিগভ্রম হয়ে এই কাণ্ডটি করে। আমার মনে হয়, হরমোন গ্রন্থির কোনো স্ফুরণ বা ক্ষরণের ফলে এটা ঘটে থাকে। কেননা এরা একটা ঘোরের মধ্যে এই কাণ্ডটা করে। সবই পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

প্রজননকাল মার্চ-এপ্রিল। চিরহরিৎ জঙ্গলে, জঙ্গলাকীর্ণ গিরিখাতের গায়ে সুড়ঙ্গ করেই বাসা বানায়। কখনও দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে গাছের বেশ উঁচুতে কাণ্ডের মধ্যে গর্ত করে বাসা বানাতে। ডিম পাড়ে 5-6 টি চকচকে সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·07, চওড়ায় 0·91 ইঞ্চি।

4. **নীলকান মাছরাঙা** (আলসেডো মেনিনটিং)। বাংলা-হিন্দী নাম নেই। ইংরেজী—ব্লু-ইয়ার্ড কিংফিশার। মানিচক গণের (আলসেডো) এক প্রজাতি।

লম্বায় 6 ইঞ্চি। মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতো দেখতে, তবে আকারে ছোটো। সেকারণে সাধারণ লোকে তফাৎ ধরতে না পারায় নামকরণ হয় নি। চোখের নিচে কানের উপর ছোটো মাছরাঙার বাদামী টানের জায়গায় এদের নীল। কনীনিকা পাটকিলে, উপরের চঞ্চু শিঙে পাটকিলে নিচের চঞ্চু পাটকিলে, মুখের ভিতর কমলা-প্রবাল, পা ও নখর কমলাপ্রধান।

বাসস্থান নেপাল, সিকিম, ভূটান আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা; পশ্চিমঘাট অঞ্চলে গোয়া, মহীশূর, নীলগিরি পর্বত, কেরালা; শ্রীলঙ্কা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য—মাছ ও জলজ কীট।

স্বভাব—মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতন। একেবারে জঙ্গলের বাসিন্দা। একাই বিচরণ করে। পাহাড়ী নদীর কিনারে ঝুলেপড়া ঝোপের উপর ব'সে থেকে মাথা ও লেজ নাড়ায়। শিকার দেখতে পেলেই জলের উপর সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সময়ে সময়ে জলের তলায় গভীরে চলে যায় এবং ছোটো একটি মাছ মুখে করে উঠে পাশের একটা ঝোপের ভিতরে চলে যায়। ডাকও ছোটো মাছরাঙার মতো, তবে কিছুটা জোর।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট, কিন্তু মে-জুন মাসেই বেশি। নদীর পাড়ে গর্ত করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 5-7টি প্রায় গোলাকার চকচকে সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 0·80, চওড়ায় 0·70 ইঞ্চি।

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী। আলাপ হল সুশান্তর সঙ্গেও। ছোট শহরের জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে এল—একমাত্র সুশান্ত ও ক্যাশিয়ার ছাড়া। সরযূ-প্রসাদেরও কোন খবর নেই। লোকটা কি বেপাত্তা হয়ে গেল?

সতীনাথবাবু হঠাৎই আবার এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে—তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর। খাওয়া-দাওয়ার পর সতীনাথবাবুই কথাটা পাড়লেন—'আজই রাত্রের ট্রেনে ফিরে যেতে হবে। একটু থেমে বললেন, 'তোমাদের শহরের পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। বড় কর্তার ওপর বেশি ভরসা করি নি, কিন্তু ছোট কর্তাকে দেখে মনে হ'ল তিনি এ কেসটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলে এলাম ব্যাঙ্কে। নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে ও আলাপ করে এলাম।

।। দশ ।।

ছোট্ট শহরের মধ্যে এই নদীর ধারটাই খুব লোভনীয়। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে পাশাপাশি একটা বাঁধানো রাস্তাও চলে গেছে; তবে পিচ্ দেওয়া নয়, সুরকি দিয়ে বাঁধানো। তা বেড়াবার পক্ষে তাতে কিছু অসুবিধে হয় না। নদীর ওপরে ঘন ঘন রাস্তাটার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে চলে গিয়েছে। বোধ হয় শাল বন; এদিকটায় শালগাছের খুবই ছড়াছড়ি। তবে মাঝে মাঝে মহুয়া গাছও আছে বলে মনে হয়।

"মহুয়া গাছ থাকলে কিন্তু ভাল্লুকও কিছু থাকার সম্ভাবনা"—সতীনাথ বাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন।

"ভাল্লুক!" সুশান্ত একটু অবাক হয়ে বললো, "কি করে জানলেন? শুনেছি বটে নদীর ওপারে মাঝে মাঝে বুনো ভাল্লুক দেখা দেয়। তাই পারতপক্ষে কেউ নদীর ওপারে যায় না, নেহাৎ দরকার না পড়লে।"

"এঃ, এত খবর রাখ তুমি আর এ খবরটা রাখ না যে ভাল্লুকরা মদ খেতেও খুব ভালবাসে—বিশেষ করে মহুয়ার মদ? কিন্তু সময় থাকলে আমি একবার ওপারটা ঘুরে আসতাম। না না, মহুয়ার মদের ওপর আমার কোন আসক্তি নেই। মদ আমি জীবনে স্পর্শও করিনি, এমন কি ইউরোপের দুর্দান্ত শীতে শরীরকে চাঙ্গা করবার জন্যও নয়। আমার বনজঙ্গল ভালো লাগে। ভাল্লুক ছাড়া অন্য জন্তুও তো ওখানে থাকতে পারে। ধর, বাঁদর?" —বলে চোখে একটু কটাক্ষ করে সহাস্য বদনে বললেন সতীনাথ বাবু।

সুশান্তর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই ফিঙ্গারপ্রিণ্টের ফটোগুলোর কথা। ওগুলো কি সত্যি কোনও বাঁদরের হাতের ছাপ ছিল? সতীনাথ বাবু কি তারই ইঙ্গিত করতে চাইছেন?

সুশান্তকে অন্যমনস্ক দেখে সতীনাথ বাবুও চুপ করে গেলেন। দু'জনে নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন।

সূর্য তখনও ডোবে নি। পশ্চিম আকাশটা ঈষৎ একটু লালচে হয়ে এসেছে। নদীতে জল খুবই কম, কিন্তু স্রোত আছে। যেখানে জল একটু বেশি সেখানে সূর্যাস্তের লালছে আলো জলটাকেও একটু লালচে করে তুলেছে আর তা সফেন জলস্রোতে ঠিকরে পড়ছে—ভালো বাংলায় যাকে বলে বিচ্ছুরিত হওয়া।

হঠাৎ মনে হ'ল উল্টো দিক্ থেকে একজন লম্বা চেহারার লোক ছড়ি হাতে এগিয়ে আসছেন।

এখানকার স্থানীয় লোকেরা "বেওসাটেওসাই" বেশি বোঝে। তাদের বেড়াবার জায়গা সাধারণতঃ "বাজার-উজার"। নদীর ধার দিয়ে নির্জন পথে ছড়ি হাতে করে

বেড়ানো তাদের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। লোকটি কি তা হলে এ অঞ্চলের কেউ নয়, নাকি এদের মধ্যেই একটু সৃষ্টিছাড়া ?

লোকটি কাছাকাছি আসতে এবার আর চিনতে ভুল হ'ল না। আর কেউ নন, ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার মিস্টার ত্রিবেদী। আজ তাঁর পরনে বিলিতি দামী স্যুটটুট কিছু নেই। নেই সেই সযত্নে বাঁধা টাই। পরনে একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী বেশ। লম্বা ফিন্‌ফিনে ধুতির কোঁচার একটা কোণ বাঁ দিকের পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা। তবে, হ্যাঁ, পাঞ্জাবীটা বেশ দামী কাপড় দিয়ে তৈরি। সিল্কের তো বটেই, তসরটসরও হতে পারে। বাঙ্গালী ছাড়া এরকম পোশাক আর কেউ বড় একটা পরে না। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ধুতি পরাই তো একদম উঠে গেছে। বুড়োরাই কেউ কেউ পরে। তবে তাদেরও অনেকে ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার ধরেছে। ওটা বোধ হয় ইণ্টারন্যাশনাল পোশাক। অন্যান্য, প্রদেশের কেউ কেউ যারা পরে তাদের কাপড় পরার ধরনটাও আলাদা।

সতীনাথ বাবুই গোড়ায় কথা পাড়লেন—"আরে, আপনি! কিন্তু এই শ্যামবেশ" কেন ?

মিস্টার ত্রিবেদী পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "পোশাক জিনিসটা অনেকটা ডিপেণ্ড্ করে জিওগ্রাফিক্যাল এন ভারনমেণ্টের ওপর। আমাদের মত এই ওয়ার্ম কাণ্ট্রিতে ট্রাউজারের চাইতে ধুতি অনেক কম্‌ফর্টেবল্। পায়জামার চাইতেও। তাই না ? বেড্‌টাইমে তো আমি স্লীপিং স্যুটের বদলে লুঙ্গি ইউজ্ করি। দ্যাট্‌স্ স্টিল্ মোর কম্‌ফর্টেব্‌ল।"

সতীনাথ বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক বলেছেন। আমিও ধুতিটারই পক্ষপাতী। জোর করে পোশাকের বদল, যাকে আপনি বলবেন ড্রেস্ হ্যাবিট্,—তা করা বোকামি। তবে বিদেশী পোশাকই যখন ছেড়ে বেরিয়েছেন তখন বাংলার মধ্যে বিদেশী শব্দগুলোও বাদ দিলে ভালো হ'ত না কি ? বিশেষতঃ যে সব শব্দের সহজ বাংলা রয়েছে ?"

মিস্টার ত্রিবেদী যেন একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, "হাঁা, অনেকগুলি ইংরেজি শব্দ বলে ফেলেছি, না! সত্যি, মাদার টাং মাদার টাং বলে আমরা যতই গলাবাজি করি না কেন, সব ওয়ার্ডাস্ বাংলায় এক্সপ্রেস্ করতে পারিনা। ওটা কেমন হ্যাবিট্ হয়ে গেছে। অব্ কোর্স নট্ ওয়েল্, তবে চেঞ্জ করা ডিফিকাল্ট্।"

সতীনাথ বাবু তেমনি হেসে বললেন, "যাক, আপনাকে আর কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না। ও ইংরিজি বাংলা দুটোই আমরা বুঝি।"

সুশান্ত এতক্ষণ পরে কথা বললো, "উনি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন কিনা—

"সে তো বুঝতেই পারছি। বি. এন্. জি. এস্‌রাই বলে, ও'দের আর দোষ কি ?"

"বি. এন্. জি. এস্! সে আবার কারা ?"—সুশান্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"এঃ, তুমি দেখছি কিছু খবর রাখ না! ও কথাটা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, একটু ঠাট্টা করেই ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। কথাটা হচ্ছে 'বিলেত না গিয়েই সাহেব।' প্রথম অক্ষরগুলো একত্র করলে কি দাঁড়ায় বি. এন্. জি. এস্. না ?"

এবার সুশান্ত ও ত্রিবেদী দু'জনেই হেসে ফেললেন। ত্রিবেদী বললেন, "আপনি এ বয়সেও দিব্যি হাসাতে পারেন। ভারি মজার লোক আপনি। আসবেন না মাঝে মাঝে আমার ব্যাঙ্কের অফিসে ? ইওর প্রেজন্স উইল্ বি ডিলাইট্‌ফুল্।"

"ডিটো দিচ্ছি। নিশ্চয়ই যাব। যাক্, এই অবেলায় একা একা বেড়াচ্ছেন ? কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলেন ? আপনিও কবিতাটবিতা লিখেন নাকি ? কথাটা বলে সতীনাথ বাবু আবার একটু মুচকি হেসে সুশান্তর দিকে তাকালেন।

সুশান্ত ইঙ্গিতটা বুঝল, কিন্তু কোন মন্তব্য করতে সাহস করল না। এখানকার ব্যাপারস্যাপার দেখি ইদানীং সে খুব সাবধানী হবার চেষ্টা করছে।

সতীনাথ বাবু সুশান্তকে উদ্দেশ করে বললেন, "অনেকটা এসেছি, চল, এবার ফেরা যাক। অন্ধকারে না ঘোরাই ভালো। তা ছাড়া মিস্টার ত্রিবেদীও তো ফিরছেন, ও'কে সঙ্গী পাওয়া একটা উপুরি লাভ।"

মিস্টার ত্রিবেদী কি জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে একটু বোকা হাসি হেসে বললেন, "কী যা তা বলছেন! অ্যাম্ আই এ গুড্ কম্পানিয়ন্ ?"

এরপর খানিকক্ষণ কেউ আর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে ফিরতি পথে এগুতে লাগলেন।

সূর্য এখন অনেকটাই হেলে পড়েছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় ত্রিবেদীর টক্‌টকে লাল মুখখানা যেন আরও লাল লাগছিল। সুশান্ত বার বার সেদিকে তাকিয়ে দেখছিল। ত্রিবেদী স্টো বুঝতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না, তবে কথাবার্তা চালাবার জন্য সেই পুরোনো কথাটারই পুনরাবৃত্তি শুরু করলেন।—হাঁা, নেহাৎ সার্ভিসের খাতিরে বিদেশী পোশাকটা করতে হয়, নইলে এই সিম্প্‌ল্

ড্রেস্ পরে অনেক আরাম পাওয়া যায়।"

"যা বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা।"—মন্তব্য করলেন সতীনাথ বাবু। "বিদ্যেসাগর মশাই-এর সেই গল্পটা নিশ্চয়ই জানেন? সে কি, শোনেন নি! তবে শুনুন। বিদ্যেসাগর মশাই-এর পোশাক কি ছিল জানেন তো? একখানা ধুতি, গায়ে জামাটামা নয়—শুধু একখানা পাৎলা সস্তাদরের চাদর, আর পায়ে চটি জুতো। এই পোশাকেই তিনি সব সময়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। এমন কি যখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তখনও। অবিশ্যি, তাঁর খ্যাতি ছিল, তেজস্বিতার খ্যাতি, সাহিত্যরচনার খ্যাতি। দেশের কর্তাব্যক্তি ইংরেজ মহলেও তাঁর খুব নাম। তাঁকে ডাকতেন "পণ্ডিট্" বলে।

"একবার হ'ল কি, এক নতুন ছোট লাট এলেন কলকাতায়। ছোটলাট বলছি এইজন্য যে, তখন তো কলকাতাই ছিল গোটা ভারতবর্ষের রাজধানী। গোটা ভারতবর্ষের যিনি কর্তা—রাজপ্রতিনিধি তাঁকেই বলা হ'ত বড়লাট। গভর্নর জেনারেল, পরে ভাইসরয়। তিনি থাকতেন এখনকার গভর্নমেণ্ট হাউসে, যার নতুন নাম হয়েছে রাজভবন। আর, বাংলাও তো তখন ভারতের একটা আলাদা প্রদেশ, তাই তার জন্যও একজন লাট সাহেব ছিলেন। তাঁকে বলা হ'ত ছোটলাট—লেফ্-টেনাণ্ট গভর্নর। তিনি থাকতেন আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে বেলভেডিয়ার প্যালেসে। এখন যেটা হয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

"এই নতুন ছোটলাট দেশে থাকতেই বিদ্যাসাগরের কথা শুনে এসেছিলেন। তাই কলকাতায় এসেই তাঁর ইচ্ছে হ'ল বিদ্যেসাগরের সঙ্গে আলাপ করবার। কিন্তু লাটসাহেব তো আর নিজে মানমর্যাদা খুইয়ে বিদ্যেসাগরের কাছে যেতে পারেন না, তাই তাঁর পরিচিত একজন পদস্থ ইংরেজকে অনুরোধ করলেন বিদ্যেসাগরকে একদিন তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য।

"এখন সে আমলে ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হলে ধরাচূড়া পরে না গেলে সেটা অভব্যতা বলে গণ্য করা হ'ত। যাঁরা ইংরেজদের মত প্যাণ্ট কোট পরতে অভ্যস্ত ছিলেন না তাঁরাও চোকাচাপকান, মাথায় শামলা বা পাগড়ী এঁটে রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এ রকম শামলা বা পাগড়ী আঁটা সে যুগের বড় বড় লোকের ছবি নিশ্চয়ই অনেক দেখেছেন। রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরাও ঐ রকম পোশাকই পরতেন। কিন্তু বিদ্যেসাগর তো ও-সব পরবার লোক নন। তাঁর সেই ধুতি-চাদর আর চটি ছাড়া তাঁকে আর কিছু পরানো চলবে না—একথা সেই ইংরেজ পদস্থ রাজপুরুষটি ভালো করেই জানতেন। অথচ ঐ পোশাকে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাওয়াই বা কেমন দেখায়। সাহেব ছোটলাটকে বললেন, ওঁকে তো নিয়ে আসতে বাধা ছিল না—বাধা হচ্ছে ওঁর পোশাক। হি ইজ্ অল্‌মোস্ট্ নেকেড্। অর্থাৎ তিনি প্রায় উলঙ্গ হয়ে ঘোরেন।"

সাহেবদের কাছে বিদ্যেসাগরের ঐ পোশাক তো উলঙ্গের নামান্তর! চার্চিল সাহেবও তো বহু বছর পরেও গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন "দ্যাট হাফ্-নেকেড্ ফকির", অর্থাৎ ঐ অর্ধ উলঙ্গ ফকির।

"যাই হোক, সাহেবের কাছে বিদ্যাসাগরের পোশাকের বর্ণনা শুনে ছোটলাট সাহেব তখনকার মত বিদ্যেসাগরের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা দমন করে নিলেন। সত্যিই তো একটা দেশের লাট সাহেব হয়ে একজন দিশী-"প্রায় উলঙ্গ" লোকের সঙ্গে আলাপ করাটা মর্যাদায় বাধে বই কি!

"কথাটা তখনকার মত চাপা পড়লেও মুখে মুখে বিদ্যেসাগর মশাইএর কানেও পৌঁছল। শুনে বিদ্যেসাগরও বেশ আমোদ পোলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

"এর কিছুদিন পরে ছোটলাট সাহেবের একদিন সত্যি সত্যি বিদ্যেসাগরের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়লো। লাট সাহেব বিদ্যেসাগরকে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি যদি একবার বেলভিডিয়ার প্রাসাদে এসে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন তা হলে তিনি খুব খুশি হবেন।

"যথা সময়ে বিদ্যেসাগর চললেন ছোটলাট সাহেবের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পরনে কিন্তু সেই সাদা থান ধুতি, গায়ে পাৎলা একটা চাদর, আর পায়ে সেই বিখ্যাত চটি জুতো।

"তখন বৈশাখ মাস। কলকাতায় তখন ভীষণ গরম। এয়ার কণ্ডিশানিং তো দূরের কথা, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্‌টানেরও তখন রেওয়াজ হয় নি। বিদ্যেসাগর গিয়ে দেখেন লটসাহেব একটা স্বল্পালোকিত ঘরে জাব্বা জোব্বা পরে ঘামছেন আর দু'জন চাকর বিরাট বিরাট দু'টো হাত পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করছে। জাব্বাজোব্বা বলতে তখনকার ইংরেজদের পোশাকের কথা বলছি। পরনে মোটা কাপড়ের প্যাণ্ট, পায়ে মোজা আর পোল্লই জুতো। গায়ে শুধু কোটই নয় তার নিচে একটা ওয়েস্ট কোট্‌ও আঁটা। তখনও টাই পরার চল ছিল না, তাই সাহেবের গলায় কাছে একটি মাফ্‌লার জাতীয় পদার্থ ওয়েস্ট কোটের

পায়ের কাছে কেমন একটা হিস্ হিস্ শোনা গেল

ওপরের দিকে ঠেসে বাঁধা—যাতে গলাটা খোলা না থাকে। বলা বাহুল্য শীতের দেশের লোক কলকাতার সেই দারুন গরমে ঐ পোশাকে যে ত্রাহি ত্রাহি করবেন এতে আর আশ্চর্য কি ?

"বিদ্যেসাগরকে দেখেই লাট সাহেব তাঁর পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পণ্ডিট্, আই এন্‌ভি ইউ"—আপনাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।"

"বিদ্যেসাগর চটপট্ জবাব দিলেন," হিংসে হবার কোন কারণ তো নেই। যে যেটা পাবার ইচ্ছে করে অথচ পায় না তারই সেটা পাবার জন্য হিংসে হতে পারে। কিন্তু আমার এ পোশাক তো অতি সাধারণ এবং অত্যন্ত সস্তা দামের। মাত্র টাকা দুই খরচ করলেই আপনি এই পোশাকটি কিনে নিতে পারেন। হিংসে করার কোন কারণই থাকে না। দু' টাকা তো আপনার কাছে এক টিপ নস্যির মত।"

লাটসাহেব থতমত খেয়ে বললেন, "হাঁ, আমি বুঝতে বুঝতে পারছি, আপনাদের মত গরম দেশে আপনার মত পোশাকই সবচেয়ে আরামদায়ক।" এই গল্পটা শুনে সুশান্ত আর ত্রিবেদী হেসে উঠলেন। সবাই যখন গল্পে তন্ময়, তখনই পায়ের কাছে কেমন একটা সন্দেহজনক হিস্ হিস্ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই মিস্টার ত্রিবেদী সভয়ে একটা বিরাট লাফ দিয়ে এক পাশে সরে এলেন, তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল—"সাঁপ !" (ক্রমশ)

লজিকের খেলা-L

সিদ্ধার্থ ঘোষ

L-এর মতো চেহারার দুটো ঘুঁটি আর দুটো চৌকো ঘুঁটি নিয়ে মজার এই খেলাটা শুরু করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ বুঝতে পারছি। কিন্তু খেলা শুরু করার আগে খেলার সরঞ্জামগুলোকে গুছিয়ে না নিলে চলবে কি করে। পেছনের মলাটের কাছে দ্যাখো একটা কার্ডের ওপর দিয়ে ডট্-ডট্ রেখার একটা বর্গক্ষেত্র, দুটো L-ঘুঁটি ও দুটো চৌকো ঘুঁটির ছবি রয়েছে। বর্গক্ষেত্রটা হবে তোমাদের খেলার বোর্ড। এবার একটি কাঁচি যোগাড় করে ডট্-ডট্ রেখা বরাবর চৌকো বোর্ড ও ঘুঁটিগুলো কেটে বার করে নাও। লক্ষ্য করে দ্যাখো L চেহারার ঘুঁটি দুটোর রঙ আলাদা। নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, দু'জন খেলোয়াড়ের ঘুঁটি আলাদা করার জন্যই দু' রকম রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু চৌকো ঘুঁটি দুটোর রঙ একরকম কেন? ঠিক প্রশ্নই করেছ। সেটা বলা দরকার। চৌকো ঘুঁটি দুটো নিয়ে ভাগাভাগির ব্যাপার নেই। যে-কোন খেলোয়াড়ই তার দান এলে এই দুটো ঘুঁটির যে-কোন একটাকে ইচ্ছেমতো চালতে পারে।

খেলা শুরু করার আগে ঘুঁটিগুলো বোর্ডের ওপর এইভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে—

চৌকো বোর্ডটা ষোলটা খোপে ভাগ করা। এর মধ্যে ওপরে বাঁ দিকের খোপে ও নিচে ডান দিকের খোপে চৌকো ঘুঁটি দুটো বসানো হয়েছে। চৌকো ঘুঁটি দুটো রাখার জায়গায় 'ক'-হরফটা লেখা হয়েছে। L ঘুঁটি দুটো বসবে 1 ও 2 লেখা জায়গা দুটোয়। খেলার

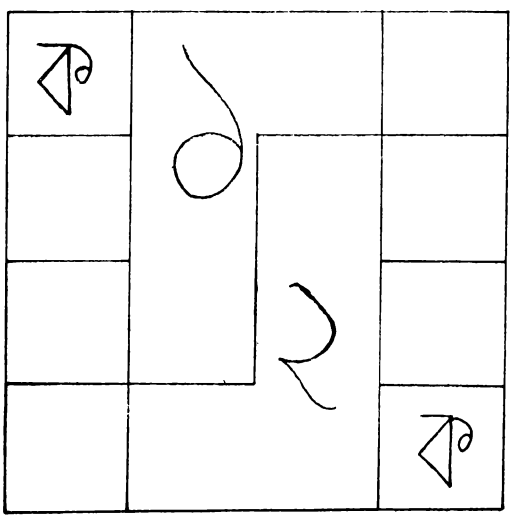

নিয়মকানুন ও চালের কথায় আসার আগে বলে নিই, প্রত্যেকটা L ঘুঁটি বোর্ডের মধ্যে চারটে খোপ দখল করে বসে আর প্রত্যেকটা চৌকো ঘুঁটি দখল করে একটা। তার মানে দুটো L ঘুঁটি ও দুটো চৌকো ঘুঁটি মিলে খেলার বোর্ডটার দশটা খোপ দখল করে। খালি খোপ্ বলতে থাকে মাত্র ছ'টা। মনে হচ্ছে নিশ্চয় যে, ঘুঁটি নাড়ার আর জায়গাই তো রইল না! আরেকটু ধৈর্য ধরো।

খেলার নিয়ম ঃ

দু'জনে মিলে খেলতে হবে। ঠিক করে নাও কে-কোন্ L-ঘুঁটিটা নেবে। এবার কে আগে প্রথম চাল দেবে সেটা নিয়ে ঝগড়া না বাধিয়ে হেড্-টেল্ করে ঠিক ক'রে নেওয়াই ভাল।

চাল দেওয়া ঃ

প্রথম খেলোয়াড়কে তার নিজের L-ঘুঁটিটা সরিয়ে চাল দিতে হবে। তার মানে L-ঘুঁটিটা যে জায়গায় আছে সেখানে থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও বসাতে হবে। তার জন্যে ঘুঁটিটাকে যে কোনোভাবে নাড়াতে পারো। এমন কি ঘুঁটিটা হাতে তুলে উল্টো ক'রে নিয়েও বসাতে পার। তবে যেখানেই বসাও চারটে খোপ পুরোপুরি দখল করে বসাতে হবে। এ খোপের অর্ধেকটা, ও খোপের সিকি ভাগ জুড়ে বসালে চলবে না। L-ঘুঁটিটা প্রথমে যে চারটে ঘর জুড়ে ছিল তার সব কটাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এমন কথা নেই। কম করে একটা পুরনো ঘর বদলালেই হল (তার মানে L-ঘুটির একটা অংশ অন্তত একটা নতুন খোপে এলেই হল)। L-ঘুঁটির চাল দেওয়ার পর প্রয়োজন হলে চৌকো ঘুঁটির যে-কোনো একটাকে যে-কোন ফাঁকা ঘরে বসাতে পার। চৌকো ঘুঁটি চালতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

প্রথম খেলোয়াড় চাল দেওয়ার পর দ্বিতীয়জনকেও একই নিয়মে তার L ঘুঁটিটা চালতে (সরাতে) হবে। আগে L ঘুঁটি না চেলে কিন্তু কেউই চৌকো ঘুঁটি নাড়াতে পারবে না।

দ্বিতীয় খেলোয়াড় L ঘুঁটি সরিয়ে বসানো ও তারপর চৌকো ঘুঁটির চাল দেওয়ার (বা না দেওয়ার) পর আবার প্রথম খেলোয়াড়ের দান।

এইভাবে পালা করে চাল দিতে হবে।

হারজিত ঃ

লুডো খেলায় যার ঘুঁটি পড়ে থাকে সে হারে। ফুটবলে যে দল বেশি গোল খায় হারে। আর L-খেলায় সে-ই হারবে যে তার চাল এলেও আর চাল দিতে পারবে না। মানে যার পক্ষে আর নিজের ঘুঁটিটাকে নড়িয়ে বসানোর কোন উপায় থাকবে না সে-ই হারবে।

প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে, তার মানে এমনভাবে

পরপর চাল দিতে হবে, ফন্দি আঁটতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে আর L-ঘুঁটিটাকে সরিয়ে বসানোর মতো একটাও জায়গা না থাকে।

খেলার বোর্ডে ষোলটা ঘরের মধ্যে দশটা ঘরই জুড়ে রয়েছে ঘুঁটিগুলো। ফাঁকা ঘর মাত্র ছ'টা। কবারই বা চাল দেওয়া যাবে? কতক্ষণই বা চলবে খেলা? নিশ্চয় এসব কথা মনে হচ্ছে তোমাদের। কিন্তু ভাবনা ছেড়ে খেলেই দেখ না!

গত সংখ্যার 'রহস্যময় নিরুদ্দেশ'-এর রহস্যভেদ

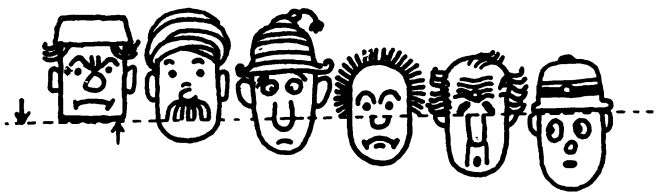

গত সংখ্যায় তোমরা রহস্যময় ছ'টা মুখের ছবি-ছাপা কার্ডটা পেয়েছ। সেই ছবিটাকে আবার দ্যাখো ওপরে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বলেছিলাম, এই ছবিটাকে মাঝখান থেকে ডট্ ডট্ লাইন বরাবর দু'টুকরো করে নিতে। তারপর এই টুকরো দুটো নাড়াচাড়া করে যুতসই জায়গায় বসাতে পারলেই ছ'টা মুখের মধ্যে থেকে একটা উধাও হয়ে যাবে। তখন দেখবে, ডান ধারের টুপিটার নিচের মুখটা আর সেখানে নেই। আমি জানি তোমরা সকলেই মুখ অদৃশ্য করে দিতে পেরেছ। তবু, বলে রাখি—ওই ছবিটার (যেটা এখানে ওপরে ছাপা হয়েছে) ওপরে বাঁ দিকে দ্যাখো একটা ছোট্ট তীর চিহ্ন রয়েছে আর নিচেও রয়েছে আরেকটা তীরচিহ্ন। তবে সেটা একটু ডান ধার ঘেঁষে। ছবিটা দু' ভাগ ক'রে ফেলার পর ওপরের তীর চিহ্নের ওপর নিচের তীর চিহ্নটা নিয়ে এসো। সেই অবস্থাতে ছবিটা কীরকম দাঁড়াবে নীচে দেখ ঃ

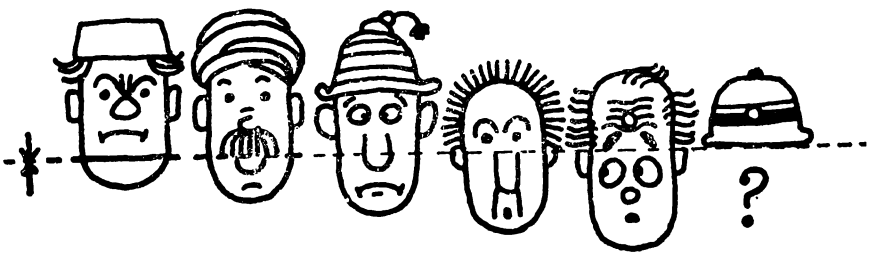

দেখছ তো, ছ'টা মুখ পাঁচটা হয়ে গেছে!

এখন প্রশ্ন হল, এটা হচ্ছে কি করে? ছবিটাতে যা ছিল তার কোন অংশই বাদ গেল না, অথচ একটা মুখ অদৃশ্য? গেল কোথায় সেটা?

ব্যাপারটা সহজে বোঝাবার জন্যে আরেকটা ছবি আঁকছি। নিচের ছবিতে দেখ সরু রেখায় কটা খাড়াখাড়া লাইন টানা

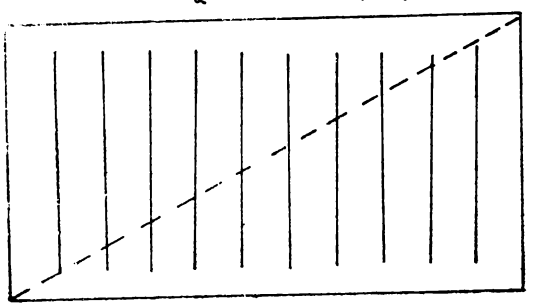

রয়েছে। সবশুদ্ধ ক'টা লাইন রয়েছে গুণে দেখ তো? হ্যাঁ—দশটা। এবার এই ছবিটাকে ডট্ ডট্ লাইন বরাবর কেটে দু'ভাগ করে ফেলা হল। তারপর নিচের টুকরোটা সামান্য একটু বাঁ দিকে সরিয়ে বসানো হল। পরের পাতার ছবিটা লক্ষ্য করো। এবার গুণে দ্যাখ তো কটা লাইন রয়েছে।

আবার সেই রহস্যময় নিরুদ্দেশ। একটা লাইন কমে গেছে।

আসলে এটা একটা জ্যামিতির ব্যাপার। লক্ষ্য করে দ্যাখো দশটা লাইনের মধ্যে আটটা লাইন দু'টো অংশে বিভক্ত। তার মানে এই আটটা লাইনের কিছুটা ওই ডট্-ডট্ রেখার ওপর আছে আর কিছুটা নিচে। ডট্-

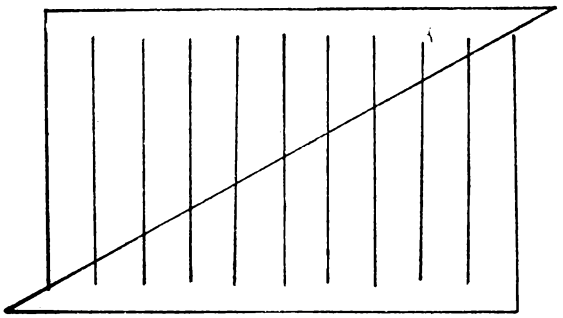

ডট্ লাইন বরাবর ছবিটাকে দুভাগ করার পর দশ'টা লাইন সবশুদ্ধ আঠারটা টুকরো হয়ে যায়। তারপর ছবি দুটোকে নতুনভাবে জোড়া লাগালে এই আঠারটা টুকরো দিয়ে তৈরি হয় ন'টা লাইন। ছবিটা ছেঁড়ার আগে তোমরা দশটা লাইনের দৈর্ঘ্য মেপে নাও। তারপর ছবিটা জোড়া লাগাবার পর তৈরী ন'টা লাইনের মাপ নাও। দেখবে দশটা লাইনের মাপ যা ছিল, ন'টা লাইনের মাপও তাই আছে। তার মানে এই পরের ন'টা লাইনের প্রত্যেকটা আগের দশটার লাইনের প্রত্যেকটার চেয়ে মাপে একটু ক'রে বড়ো। যে-লাইনটা অদৃশ্য হয়ে গেছে তারই মাপের সমান বৃদ্ধি পেয়েছে বাকী ন'টা লাইনের মোট দৈর্ঘ্য।

ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে পাশেব ছবিটা দেখলে।

এখানে পাঁচ ভাগে চারটে ক'রে মার্বেলগুলি রাখা আছে। এবার দ্বিতীয় ভাগ থেকে একটা মার্বেল প্রথম ভাগে নিয়ে এসো। তারপর তৃতীয় ভাগ থেকে দুটো মার্বেল দ্বিতীয় ভাগে নিয়ে এসো। চতুর্থ ভাগ থেকে তিনটে মার্বেল নিয়ে এসো তৃতীয় ভাগে এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চম ভাগের চারটে মার্বেলই নিয়ে এসো চতুর্থ ভাগে।

এখন দ্যাখো ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো। পাঁচ ভাগ করা হয়েছিল কুড়িটা মার্বেলকে। এখন সেগুলো চার ভাগ হয়েছে। পঞ্চম ভাগ নেই। তার মানে পঞ্চম ভাগের চারটে মার্বেল একটা একটা করে যোগ হয়েছে প্রথম

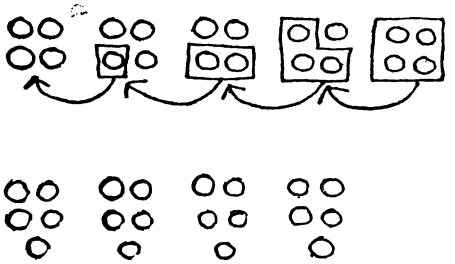

চারটে ভাগের সঙ্গে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটে কাটা লাইন জোড়া দেওয়ার সময়। গত মাসের মুখ অদৃশ্য হওয়ার রহস্যের হদিশও এইভাবেই মিলবে।

ডান দিকের টুপির তলায় যে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা ঠিক তার পাশের মুখটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আর পাশের মুখের কিছুটা অংশ চলে গেছে তারও বাঁ পাশের মুখের নিচে। এইভাবে ডান দিকের টুপির তলায় অদৃশ্য হওয়া মুখটা বাদে সব মুখগুলোই আকারে কিছু পরিমাণে লম্বা হয়েছে। এই অবশিষ্ট পাঁচটা মুখ আগের চেয়ে যতটা লম্বা হয়েছে তার মাপ ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মুখটার সমান।

এবার তোমরা নিশ্চয় মানতে রাজী হবে যে, ভৌতিক ও গাঁজাখুরি গল্পের মধ্যেই শুধু মানুষজন অদৃশ্য হয় না। জ্যামিতির মাপজোকের ব্যাপারগুলোও রীতি-মতো বিস্ময়কর হতে পারে!

● মজার ছবি

প্রনব হোড়

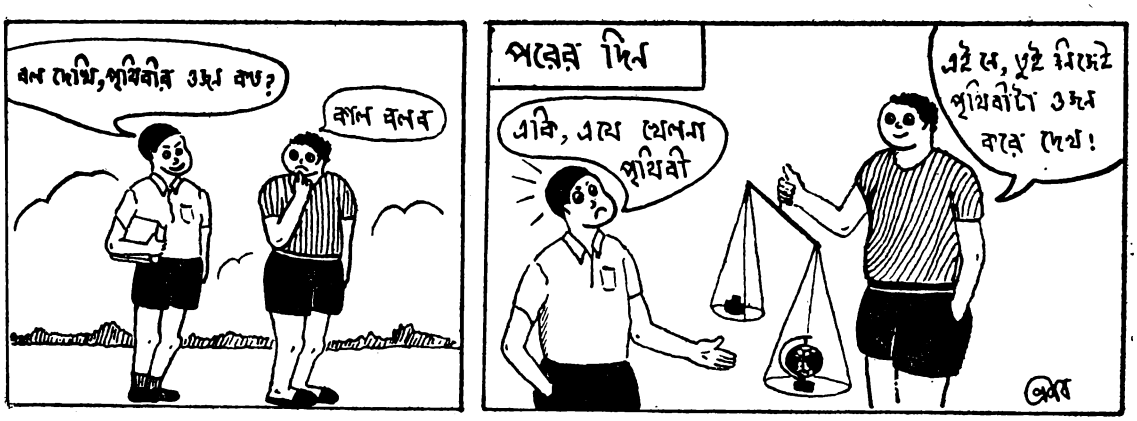

জীবন-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন ডঃ তারকমোহন দাস।

[জীবনবিজ্ঞানের ধারাবাহিক রচনা এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠকেরা সরাসরি তাদের কয়েকটি প্রশ্ন লেখকের কাছে রেখেছিলেন। প্রশ্নসহ লেখকের উত্তর এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।]

নীরদ ও বিশ্বনাথ
তুরীয়ানন্দ ভবন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

আপনার লেখা জীবন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়টি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় পড়ে আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। আমরা স্কুলে জীবন-বিজ্ঞান বিষয় পড়ি। মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, সেগুলির সমাধান আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি।

প্রশ্ন ঃ

এক ঃ 'যৌন জনন অযৌন জনন অপেক্ষা সুবিধা জনক'—কেন ?

উত্তর ঃ

1. যৌন জননের সময় মাতা-পিতার বিবিধ গুণাবলী সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়। এই নতুন গুণাবলীর সমন্বয়ের ফলে সন্তানসন্ততিরা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশি সক্ষম হয়। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, যৌন জননের সাহায্যে যারা বংশবৃদ্ধি করে তাদের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি টিঁকে গিয়ে আবার নতুন করে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। অযৌন জননের এই সুবিধা নেই ; ঐ রকম পরিবেশে তারা সবংশে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত যৌন জননের সময় মাতাপিতার দেহ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গুণের সমাবেশের ফলে নতুন নতুন জাতের জীববস্তু বা ফুলফলের উৎপাদন সম্ভব হয়। জীবজগতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তবে অযৌন জননেরও কয়েকটি সুবিধা আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে জীবরা অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্যের সঙ্গে বংশবৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় এবং মাতৃদেহের সকল বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কলমের গাছে তাই ফুল ও ফলের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে, আঁটির গাছে সেটা হয় না।

প্রশ্ন ঃ

দুই ঃ আমাদের ফুসফুসকে রেচনাঙ্গ বলা যায় —কেন ?

উত্তর ঃ

2. কোষ-মধ্যস্থিত বিপাকজাত দূষিত, অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যে অঙ্গের সাহায্যে মোচন হয় তাকে রেচনাঙ্গ বলে। ফুসফুসের সাহায্যে কোষ মধ্যস্থিত বিপাকজাত দূষিত পদার্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড মোচন হয়, তাই ফুসফুসকে রেচনাঙ্গ বলা হয়।

তিন ঃ শ্বসনের সময় স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে সর্বাধিক তাপ শক্তি পাওয়া যায় কেন ?

উত্তর ঃ

3. শর্করার থেকে স্নেহজাতীয় পদার্থে কার্বনের পরিমাণ বেশি থাকে ও অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের সম্পূর্ণ জারণের সময় শর্করার তুলনায় অনেক বেশী ATP উৎপন্ন হয়। তাই শ্বসনের সময় স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে সর্বাধিক তাপশক্তি পাওয়া যায়। নিচের সমীকরণটি লক্ষ্য কর ঃ

$$C_{51}H_{98}O_6 + 72{\cdot}5\ O_2 \rightarrow 51CO_2 + 49H_2O + 7590\ kg.\ Cal.$$

তপনকুমার ব্রহ্ম

পোঃ—দেবীনগর, ভায়া—রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। জীবনবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে জানতে পারলে খুশী হব।

প্রশ্ন ঃ

এক ঃ কোন্ স্তন্যপায়ীর রক্তের রং সাদা ?

উত্তর ঃ

1. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাদের লোহিত রক্তকণিকা থাকে যাতে হিমোগ্লোবিন নামে লাল

রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনশূন্য সাদা রক্তের কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী নেই।

প্রশ্ন ঃ দুই ঃ হিমোফিলিয়া এবং বর্ণান্ধতা বাদে আরো কয়েকটি বংশগত রোগের নাম জানালে খুশী হব।

উত্তর ঃ

2. যেমন Mongolism, Muscular dystrophy, Huntington's chorea (মস্তিষ্কে বহির্ভাগের ক্ষতিকর পরিবর্তন)।

প্রশ্ন ঃ তিন ঃ অবাত শ্বসনে কি ইথাইল অ্যালকোহল ও জল উৎপন্ন হয়? নাকি ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড?

উত্তর ঃ

3. ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তবে অবাত শ্বসনের সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইথাইল অ্যালকোহলের বদলে ল্যাকটিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

নির্মলেন্দু মাইতি
গ্রাম+পোঃ—নারায়ণচক, মেদিনীপুর।

আমি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক। আপনি এই পত্রিকায় জীবন-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করেন। তাই আপনার কাছে একটি প্রশ্ন পাঠালাম। উত্তর পেলে খুশী হব।

প্রশ্ন ঃ নবজাতক শিশুর ছয় মাস হবার পর তাকে ভাত খাওয়ায়। এর কি কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে?

উত্তর ঃ

এটি একটি সামাজিক প্রথা বা সংস্কার। আমাদের অধিকাংশ সংস্কারেরই কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই, মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান করবার প্রবণতা থেকে সেগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এটুকু বলা যায়, ছয় মাস বয়স অবধি শিশুর ভাত খাওয়া যদি বন্ধ থাকে, তা হলে তার পরিবর্তে মাতৃদুগ্ধ পান করবার শিশু সুযোগ পায়, আর ভাতের থেকে মাতৃদুগ্ধ যে শিশুর পক্ষে অনেক উপকারী সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ছয়মাস (পাঁচ বা সাত মাস হলেও ক্ষতি নেই) বয়স থেকে শিশুকে কিছু খাদ্য খাওয়ানো দরকার এবং তার ক্যালোরি চাহিদাও বাড়তে থাকে। সেটা মাতৃদুগ্ধে পূরণ অনেক সময় হয় না। সুতরাং ঐ বয়স থেকে ভাত খাওয়ানো সুরু করা যেতে পারে, সেটা তার শরীরের পক্ষেও প্রয়োজন।

তোমরা কি জানো?

তোমাদের জন্য তিনটে বাঘা বাঘা বই আমরা প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো ঃ

আবিষ্কারের পিছনে ১৬৲

ডাঃ মনীশ প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন সমরজিৎ কর

তোমরা তো জানো, অসুখ করলে আমরা ওষুধ খাই, ইনজেকশন নিয়ে থাকি, কিন্তু কি ভাবে এতসব আবিষ্কার হলো তা হয়তো জানো না, ডাক্তারী শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের নানান কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক—যা কিন্তু গল্প নয় মোটেই, সত্যি। সোজা কথায় তোমাদের জন্য অসাধারণ একটি বই।

আমাদের দু নম্বর বইটি হলো

বিজ্ঞানের হরেকরকম ৭৲

অনীশ দেব

এতে আছে ঃ মাপ কি করে এলো, পশুপক্ষীর শরীরে তাপ কিভাবে তৈরী হয়, বুদ্ধি কি করে মাপে, পৃথিবী কেমন দেখতে বা টিভিতে যা দেখা যায় না, এসব আশ্চর্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা। এগুলো নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রতি পাতায় মজার মজার ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক নিজেই।

তিন নম্বর বইটিও কিন্তু প্রথম দুটোর চেয়ে কম নয়! এতে আছে ঘড়ি ও সময় মাপা নিয়ে নানান অজানা কথা

ঘড়ি নিয়ে রূপকথা ৭৲

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আদিম মানুষ কি করে সময় মাপতে শিখলো, কি ভাবে আবিষ্কার হলো ছায়াঘড়ি, সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি। এছাড়া ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পারমাণবিক ঘড়ি তো আছেই। সব মিলিয়ে এ এক মজার বই। সঙ্গে অনেক ছবি ও দুটো ফটোগ্রাফ।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

যে যে বইটা হাতে পেতে চাও পাঁচ টাকা অগ্রিম সহ নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ড পাঠাও। তাহলে ঘরে বসেই পেয়ে যাবে।

স্বপ্নদীপ ॥ ৭ই শীতলা লেন, কলকাতা-৫

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার অক্টো-নভে '82 সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা—শুভাশিষ আতর্থী, শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী, অরূপকুমার পাল, জয়দেব বসাক, মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, লক্ষ্মীনারায়ণ শীল, প্রণবকুমার সরকার।

চব্বিশ পরগনা ঃ আশিস সরকার, মানস বোস, সমীরণ বিশ্বাস, সুগত দত্ত, ছন্দা দাস, তমাল ঘটক, প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য।

হাওড়া—গৌতমকুমার পাণ্ডা, কল্যাণকুমার পাত্র মৌসুমী খাঁ, শিল্পশ্রী সেন।

হুগলী—সৌরভ সরকার, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, সুরজিৎ পাল, অম্বরজিৎ রায়, অভিজিৎ রায়, মলয় মোহান্ত, অপর্ণা ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, বিনয় ভট্টাচার্য, মলয় ভট্টাচার্য, অপূর্ব চক্রবর্তী, রাণ্টু মজুমদার, টুকুন ভট্টাচার্য্য, শিবনাথ খাঁ, অমিতাভ চ্যাটার্জী, শ্রীকান্ত শীল, শুকদেব শীল, আশিস চ্যাটার্জী, এ. টি. এস. মোদাব্বের-হোসেন।

বর্ধমান—গৌতম সাহা, কৃষ্ণ সেন, উত্তম সেন, প্রদীপ সেন, বিকাশ কুমার, বিজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমীক্ষা ধাড়া, সব্যসাচী রায়, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সিংহ, তরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, নন্দিতা সিংহ, দেবকুমার দে, সৌমেন মুন্সী, সুরজিৎ কুমার কুণ্ডু, ফাল্গুনী দাস, জয়কুমার দে।

নদীয়া—মানস কুণ্ডু পল্লব মোহান্ত, শ্যামল বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা।

মেদিনীপুর—দীপক ষড়ঙ্গী, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, সর্বানী ষড়ঙ্গী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, হিমাদ্রি পাল, চন্দন দাস, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, দেবব্রত দাশ, প্রসিতকুমার সরকার, দেবাশীষ মণ্ডল, বিকাশচন্দ্র বিশ্বাস, অমিয়কান্তি বিশ্বাস, চন্দনকুমার পানি, তুষারকান্তি পাল, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চিন্ময় সিংহ, অমৃতময় সিংহ, শতদ্রু সাহা, শান্তনু সাহা, মিহির সাহা, পার্থপ্রতিম মাইতি।

বীরভূম—সুদীপ্ত দত্ত, সন্দীপন দত্ত, দীপনারায়ণ দত্ত, পল্লবকুমার সিংহ, চন্দন চৌধুরী।

বাঁকুড়া—সৌমেন মণ্ডল, সুরজিৎ নন্দী, অজয়কুমার মিত্র।

পুরুলিয়া—নিলয় দত্ত, দিলীপকুমার ঘোষ রাণা, বিভু,

পঃ দিনাজপুর—সঞ্জয় সাহা, শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়, বিকাশ দে, সুজিৎকুমার দাস নারায়ণচন্দ্র পাল।

মালদা সরিৎকুমার দাস, অনির্বাণ বিশ্বাস, অনিন্দ্য বিশ্বাস, শম্পা বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ—অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, অয়ন ভট্টাচার্য, পল্লব চ্যাটার্জী, নিমিলিতা চ্যাটার্জী, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ, মানস মোহান্ত।

জলপাইগুড়ি—জয়জিৎ লাহিড়ী।

কোচবিহার—দীপককুমার কার্য্যী,

আসাম ঃ ডিব্রুগড়—রজত দাস, রাহুল দাস।

গত সংখ্যায় বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ঃ সমাধান

1। অ্যালুমিনিয়াম 2। পঁচাত্তর ভাগ 3। সীসা 4। রূপা 5। ক্রোমিয়াম 6। সোনা 7। শব্দের বেগ বাড়ে। 8। বেশি থাকে 9। শূন্য মাধ্যমে 10। প্রদত্ত তাপ লীন তাপের খ্যাতে ব্যয়িত হয় বলে। 11। 'জিব্রালিন' নামক উদ্ভিদ হর্মোন প্রয়োগে 12। প্রশম বা শমিত লবণ 13। সবুজ আলোর 14। ক্যাক্টাস 15। সুন্দরী বা সুঁদরি নামক গাছকে 16। কোন স্নায়ুতন্ত্র নেই।

প্রশ্ন-উত্তর

প্রঃ যদি রেডিও চলাকালীন রেডিওর আওয়াজ জোর করা হয় তা হলে কি কারেণ্ট বেশি পোড়ে ? যদি কম করে দেওয়া হয় তা হলে কি কারেণ্ট কম পোড়ে ?

নিমাই, বালী, হাওড়া।

উঃ—Valve-set (Main set) রেডিও জোরে বাজলেও বেশি শক্তি ব্যয় হবে না, কিন্তু ট্রানজিস্টর রেডিও যত জোরে বাজানো যাবে তত তাড়াতাড়ি ব্যাটারির আয়ু কমবে।

প্রঃ রেডিও চলাকালীন যদি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় তবে মিডিয়াম ওয়েভ তরঙ্গে সেই শব্দ ধরা পড়ে, কিন্তু শর্ট ওয়েভ তরঙ্গে ঐ শব্দ ধরা পড়ে না কেন ? এই আওয়াজে রেডিওর কি কোন ক্ষতি হবে ?

অসীম কুমার দত্ত, চন্দ্রকোণা রোড, মেদিনীপুর। নিমাই বালী, হাওড়া !

উঃ—এ-অবস্থায় রেডিও বন্ধ রাখাই ভাল। বিশেষ ক্ষেত্রে-স্পীকারের কয়েলটি পুড়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ চমকালে শর্ট ও মিডিয়াম ওয়েভ দুটিতেই সেই আওয়াজ ধরা পড়তে পারে।

প্রঃ —পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে ? কোন কঠিন পদার্থ না গলিত পদার্থ ?

সুলেখা মুখার্জী, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

উঃ—পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট ধাতু গলিত অবস্থায় আছে কিন্তু উপরি পৃষ্ঠের—কিছু নিচে অবধি তা কঠিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়। যতই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এগনো যায় ততই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে বলেই এই ঘটনা ঘটে।

প্রঃ —বাড়িতে বৈদ্যুতিক খরচ পরিমাপের জন্য যে মিটার ব্যবহৃত হয় তাতে—বিদ্যুৎ চলাকালীন এক প্রকার শব্দ হয় কেন ?

মানিক পাল, কৃষ্ণপল্লী, মালদহ।

উঃ —এ সি মিটারেই এরকম আওয়াজ হয়। এই মিটারের কয়েলের অভ্যন্তরে যে লোহার 'কোর' থাকে তাতে সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার করে কম্পন হয়। এই কম্পনের কারণেই আওয়াজ শোনা যায়।

প্রঃ—আমরা জানি যে, বিজলী বাতি তৈরী-করার জন্য বায়ুশূন্য কাচের-গোলক ব্যবহার করা হয় এবং আজকাল কাচের গোলকে আর্গন ইত্যাদি-নিষ্ক্রিয় গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। বায়ুপূর্ণ কাচের গোলক ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হত ?

দিলীপকুমার প্রতিহার-, গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।

উঃ—বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন আছে। ফিলামেণ্টটির (যেটি উত্তপ্ত হয়ে আলো দেয়) দহন ঘটত এবং সেটি নষ্ট হয়ে যেত।

প্রঃ মে মাসের প্রথম দিনের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ পশ্চিম আকাশে অত্যন্ত উজ্জ্বল গোলাপী রংয়ের আলো দেখতে পেলাম। প্রায় আধ মিনিট পরে সেটা নিভে গিয়ে একটা খুব ছোট অনুজ্জ্বল গ্রহের আলোর মতো আলো দেখা গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। শেষে আলোক এমন-ভাবে দেখা দিল যাতে মনে হলো প্রথম আলোটা জ্বলা-কালেও ওটা জ্বলছিল, কিন্তু অনুজ্জ্বল ও ছোট বলে প্রথমে দেখা যায় নি। আলো দুটে কি ?

কল্যাণ-হালদার, শুক্লা হালদার, পুণ্যশ্লোক হালদার গড়িয়া, ২৪ পরগনা।

উঃ—ওই সময় পশ্চিমাকাশে মেঘ থাকা সম্ভব এবং হয়তো দীর্ঘাকারে বিদ্যুতের চমক দেখা গিয়েছিল।

মজার পরীক্ষা

তাপসকুমার রায়

1. আলো ধারণ করে যে—এই বাক্যটি সংক্ষেপ করলে হয় ফসফরাস। ফসফরাস দু ধরনের—সাদা ফসফরাস ও লাল ফসফরাস। আমরা দেশলায়ের বাক্সের দুধারে লাল ফসফরাস দেখতে পাই !

আচ্ছা, যদি জিজ্ঞেস করি, আগুন নেভাতে কি ব্যবহার করবে ? তখন উত্তর আসবে জল। কিন্তু, এই জলের মধ্যে কি আগুন জ্বলতে পারে ? জলের মধ্যে আগুন জ্বালাতে গেলে একটি বীকারের মধ্যে এক টুকরো সাদা ফসফরাস আর পটাসিয়াম ক্লোরেট নিতে হবে। তারপর বীকারের মধ্যে জল ঢেলে দিতে হবে এবং কাচদণ্ডের সাহায্যে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে তার উপর ফেললেই জলের মধ্যে আগুন জ্বলতে শুরু করবে।

2. মনে কর, তুমি অন্ধকার ঘরে বসে আছ। একজন তোমার নাম জিজ্ঞেস করলো। তখন তুমি যাদুকরের মত একটু কায়দা করে তোমার নাম বলবে। সেই কায়দাটি এইরকম—

এক টুকরো সাদা ফসফরাস CS_2 [কার্বন ডাই সালফাইড]-এর মধ্যে দ্রবীভূত করে একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর। একটি সাদা কাগজ নাও। একটা কাচদণ্ডে তুলো জড়িয়ে ঐ দ্রবণে ডুবিয়ে ঐ কাগজে তোমার নাম লেখ। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, সবুজ আলোতে তোমার নাম ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

গ্রাম + ডাকঘর— কুলিয়া, রানাঘাট অঞ্চল, বাগদা।

তথাগত চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গার ঘাট বরাবর যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, সেই রাস্তার উল্টোদিকে ময়দানের মধ্যে একটা বট গাছের গোড়ায় চুপ করে বসে আকাশের তারা দেখছিলাম। কালো আকাশে মিটমিটে সাদা তারাগুলোতে বুদ্ধিমান জীবদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাবছিলাম।

কলেজ শেষ করে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ এখানে চলে এসেছি শহরের কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে। আশ্চর্য, এমন শান্ত, নির্জন জায়গা এই জনবহুল শহরে দুটো আছে কিনা সন্দেহ। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত রাস্তায় গাড়িগুলোকে ভালভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই এই জায়গাটায় একটা ধোঁয়াশার দরুন অন্ধকার সৃষ্টি হওয়ায় সাত-আট ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছি না।

কালো স্টিল ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে দেখলাম পশ্চিমের আকাশে লাল মেঘের আভাস। বৃষ্টি হবে বোধ হয় এই ভেবে ওঠবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। আজকে বাড়ির সবার সঙ্গে নাইট-শোয়ে সিনেমা যাওয়ার প্ল্যান বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যাবে এই আশঙ্কায় জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তখনই ঘটলো ব্যাপারটা।

বট গাছের সামান্য দূরে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর একটা ছোটখাটো ধূলোর ঝড় উঠলো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো প্রচণ্ড শব্দে। ভাবলাম মাথায় আকাশ বুঝি ভেঙ্গে পড়লো। তাই যখন সবে ছোটবার জন্য পা বাড়িয়েছি তখনই বটগাছের কাছাকাছি সেই ধূলোর ঝড়ের মধ্য থেকে একটা সুক্ষ্ম আলোর হলকা যেন ঝলসে উঠলো। বুঝতে পারলাম আমি আর নড়তে পারছি না। আমার টান টান করা শরীরে যেন এক ফোটা রক্তবিন্দু অবশিষ্ট নেই, মনটাও যেন আশ্চর্য হালকা লাগছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম দৌড়নোর ভঙ্গিতে আমাকে প্রাচীন গ্রীসের এক অলিম্পিক দৌড়বীরের পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতন লাগছে, কেমন যেন জড় ..অস্বচ্ছ দৃষ্টি। মনে হল যদিও আমার আশেপাশে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে, আমার গায়ে এক ফোঁটাও পড়ে নি ফাঁকা মাঠে দাঁড়ানো সত্ত্বেও।

মুহূর্তের মধ্যে একটা অতিকায় স্বচ্ছ কাঁচের ফাঁপা নল যেন ওই ধূলোর ঝড় থেকে নিঃশব্দে জন্ম নিলো। আস্তে আস্তে একটা শোঁ শোঁ হওয়ার টান, যার গতিবেগ কম করে দুশো কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়, আমাকে টেনে নিয়ে গেল সেই নলের মধ্যে। তারপর অবিশ্বাস্য গতিবেগে, জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, আমি যেন এক চলমান সিঁড়ির সাহায্যে উপরে উঠে গেলাম। মাথায় একটা আঘাত, তীব্র এক যন্ত্রণার পর মুহূর্তে আমার জাগতিক চেতনা বিলুপ্ত হ'ল।

বেশিক্ষণ নয়। এরই মধ্যে বুঝতে পারলাম, হাতপা নাড়তে পারছি না। তারপর এক সময় জয় মা বলে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমি একটা নিঃস্তব্ধ হলঘরের

এক কোণায় পড়ে আছি। মাথা ঝিমঝিম করা সত্ত্বেও টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। বিশাল হলঘরের এক গোপন কোণ থেকে অপার্থিব আলো হঠাৎ দপদপ করে জ্বলে উঠলো। এক কোণায় দেখতে পেলাম একটা যন্ত্র, অনেকটা যন্ত্রগণকের মতো। চারিদিকে অসংখ্য লিভার, কম্পনযন্ত্র, দূরদর্শনের পর্দা ও গতিনির্ধারক যন্ত্র বসানো আছে। কিন্তু যন্ত্রটার পাশে ওটা কি?

সাড়ে সাত ফুট লম্বা বলিষ্ঠ কামানো মাথাওয়ালা জীবটাকে দেখে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত পা পর্যন্ত বয়ে গেল। সারা গা থেকে হালকা নীল-সাদা এক উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমি চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। পারলাম না। বুঝতে পারলাম আমার গলা ভয়ে বন্ধ হয় নি, বরং কিরকম আড়ষ্ঠ, যা ঠাণ্ডা কিছু খেলে হয়।

লোকটা অবলেশহীন মুখে একটা সুইচ টিপে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা চকিতে ঘুরে গিয়ে সূক্ষ্ম আকারে আমার মাথার পেছনে পড়লো। কে যেন কানে কানে বাংলায় বলে উঠলো, 'পৃথিবীর জীব, আমাদের মহাকাশযানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

আমার কাছে তখনই সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই লোকটা টেলিপ্যাথি করছে—যাকে বলে মনসম্প্রসারণ। আমি মনে মনে বললাম —"আমি কোথায়?"

"বেশি দূরে নয় বরং কাছেই, প্রায় ১০,০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত একটা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে।"

আমার মাথা বনবন করে ঘুরে উঠলো। কোথায় ছিলাম কলকাতা ময়দানের মধ্যে, এখন 30,000 আলোক বর্ষ দূরের এক কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যকার অজানা অচেনা স্থানে। এই লোকটা (বা জীবটা) কি বলছে? 30,000 আলোকবর্ষ কি কাছের জায়গা? যেখানে এক আলোকবর্ষ মানে ট্রিলিয়ান মাইল।

—"বিশ্বাস না হয় সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে পারি। আমাদের গ্রহে এমন একটা সময় এসেছিলো যখন যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সময় আমাদের আমাদের প্রাকৃতিক শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে বসেছিল। বিশেষ করে যান্ত্রিক শব্দের আওয়াজের দরুন আমাদের দেহে বিপুল ক্ষতি ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম, এই সঙ্কটকালে মানসিক শক্তি, যার চর্চা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি, আমাদের কাজে লাগবে। টেলিপ্যাথি, হিপনোটাইজ, মেসমোরাইজ, গণসম্মোহন ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে দেহের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গতে রূপান্তরিত হল। আমাদের কয়েকজনের এমন মানসিক শক্তি দেহের মধ্যে তৈরী হতে পারে, যার সাহায্যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। বর্তমানে আমাদের গ্রহে গৃহযুদ্ধ চলছে আমরা শক্তিশালী কয়েকজন মানসিক শক্তির অসীম ক্ষমতার সাহায্যে ব্ল্যাকহোলের মরণটানকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করে, তারই এককোণে মহাকাশযান রেখেছি। ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণের টান প্রচণ্ড। যে কোন আলোকরশ্মিকে অনায়াসে বেঁকিয়ে ফেলতে পারে। আমরা প্রথমে মানসিক শক্তির সাহায্যে যে কোন গ্রহ থেকে বিশেষ বিশেষ কতগুলো প্রাণীদের অণুতে পরিণত করি। তারপর আলোর গতির সমান জোরে টেনে আনি মহাকাশের এক বিশেষ স্থানে।"

"সেই বিশেষ স্থান থেকে ব্ল্যাকহেলের মার্ধ্যাকর্ষণ টানের শুরু। সেই বিশেষ স্থানে আনামাত্র বিন্দুমাত্র মানসিক শক্তি খরচ না করে, টানের জোরে, আমাদের মহাকাশ-যানের একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠে চলে আসে আপনা-আপনি। আমরা তারপর সেই অণুকে ইচ্ছামতন আকৃতি বানিয়ে আগের মত করে দিই।"

—"কিজন্যে আপনারা আমাদের মানে অন্য প্রাণীদের নিয়ে আসছেন?"

'—আমরা প্রাণীদের শবব্যবচ্ছেদ করে তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্পর্কে মতামত ঠিক করে যন্ত্রগণকে পুরে দিই। এর ফলে সারা মহাবিশ্বকে আমাদের পদতলে আনতে বেশি সময় লাগবে না। সমস্ত কাজ করছে এই যন্ত্রটা, মানে হিপনোটিক প্রজেকটার।"

আমি সবশুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কোথাকার কে কলকাতার অমিত রায় 30,000 হাজার আলোকবর্ষ দূরে ব্ল্যাকহোলের মধ্যে এক অতি উন্নত প্রাণীর পরীক্ষা-গারে প্রাণ নিয়ে পালাবে কি করে?

সাত ফুটের বেশি লম্বা লোকটা আমার মনে কথা অতি সহজে বুঝতে পারলো।

'—না, না, না, পালানো অসম্ভব। কেউ পালাতে এতদিন পারে নি, পারবেও না। আমরা এক্ষুণি আপনাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আপনার উপর কাজ শুরু করব। কছু বুঝতে পারবেন না, এমনই আমাদের যাদু...।'

আমার মনের মধ্যে সুপ্ত চেতনা জেগে উঠলো। আমি যে ক্যারাটে শিখছি ফলেজের ফাঁকে ফাঁকে, মনে পড়ে গেল। সজোরে পা ছুঁড়ে দিলাম ওই জীবটাকে লক্ষ্য করে।

মাঝপথে কিসের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেলাম

মনে হল অদৃশ্য কোন শক্তিশালী বিদ্যুতের দেওয়ালের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হল। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। চারিদিকে নানা রঙের আলোর ফুলকি আর ফুলকি! অসহ্য যন্ত্রণা ছাপিয়ে কানে ভেসে এলো এক মানসিক শব্দতরঙ্গ।

'শকটা বাড়ালে মরবার বেশ সুযোগ ছিল, তবুও পরের কথা ভেবে রেহাই দিলাম। তা হলে কাজ শুরু করা যাক।'

আমি ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। উত্তেজনায় ও মৃত্যুভয়ে আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছি। নিমেষে মনে পড়ে গেল এই প্রাণীরা যান্ত্রিক শব্দের আওয়াজে অসুস্থ বোধ করে। আমি সাংঘাতিক জোরে চেঁচালাম "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে। আমার গলার স্বর খুলে গেল। আবার···আবার চেঁচালাম আরো জোরে, তিনবার চারবার। নিঃশব্দ হলঘরে আমার আর্তনাদ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে গেল।

কোন অপার্থিব যান্ত্রিক আর্তনাদ আমার মস্তিষ্ক আছন্ন করে ফেললো। গোলাপী রঙের ধোঁয়ায় হলঘরের সেই যন্ত্রটা আর লোকটা ঢেকে গেল। আমি কোনমতে আনন্দের সঙ্গে দেখলাম দৈত্যকায় প্রাণীটার সর্বত্র ফাটল ধরে গেছে। আমি বললাম,—"আমি শিগ্‌গির এখান থেকে আমার গ্রহে ফিরে যেতে চাই।"

হলঘরের সমস্ত জায়গায় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগলো। একটা শোঁ শোঁ শব্দের আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগলো। সেই গাঢ় লাল আলোটা নিভে গেল, তার বদলে একটা সবুজ আলো সেই যন্ত্রটার একটা লিভারের ওপর পড়লো।

আমার সারা শরীর যেন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেটে পড়তে চাইলো। জড় শরীর নিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি যেন অসীম অন্ধকার দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচে নামছি। কে যেন বলে উঠলো —"আবার দেখা হবে পৃথিবীর জীব।"

আমি শুনতে পেলাম গাছগাছালির খসখসানি, অপসৃয়মান মোটর গাড়ির হর্ন, দেখতে পেলাম ময়দানের ধূলোর ঝড়। আর বুঝতে পারলাম আমি আবার যাদু-মন্ত্রে আমার চিরপরিচিত কলকাতায় ফিরে এসেছি।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। বটগাছের তলায় আশ্রয় নিলাম একরাশ বিস্ময় আতঙ্ক ও কৌতূহল-মাখা মন নিয়ে, 30,000 আলোকবর্ষ দূরের এক ব্ল্যাকহোলের সফর শেষ করে।

মনে পড়ে গেল, ওই দৈত্যকায় প্রাণীটার শেষ কথা-গুলো। ওদের সঙ্গে আমার দেখা আর কি কোনদিন হবে? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে?

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে কতক্ষণ সময় লাগলো। ঘড়ির দিকে তাকাতেই আমার পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে উঠলো। এক অবিশ্বাস্য আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরলো।'

ঘড়ির সময়—সাতটা বেজে এগারো মিনিট।

ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-14

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

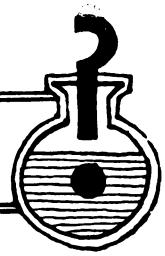

অমরনাথ রায়

1। দু'টি বৈদ্যুতিক কোষকে সমান্তরালভাবে লাগালে কি সুবিধা পাওয়া যায়?

2। নৌকা যখন স্রোতের অভিমুখে যায়, তখন তার উপর কোন্ বল কাজ করে?

3। পরমাণুর মৌলিকত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?

4। কৃত্রিম জিন্ প্রথম প্রস্তুত করেন কে?

5। ক্রোমোজোমে পুঁতির মত সাজানো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকাকে কি বলে?

6। সূর্যগ্রহণের সময় কোন্ বস্তু আলোকরশ্মির পথে প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করে?

7। মানুষের সুষুম্না নার্ভের সংখ্যা কত?

8। মানুষের কতগুলি পঞ্জরাস্থি (Rib) থাকে?

9। শীতঘুমের সময় ব্যাঙ কিসের দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়?

10। মূলরোম কোন্ প্রক্রিয়ায় মাটির রস শোষণ করে?

11। আলোকের বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন কে?

12। পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা কত?

13। I.S.R.O. কথার অর্থ কি?

14। সূর্য থেকে কোন্ পদ্ধতি দ্বারা তাপ পৃথিবীতে আসে?

15। কোন্ উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?

16। শক্তির নিত্যতার সূত্র তড়িৎক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি?

কালোবাজারীর নাগপাশ না কাটালে সর্বনাশ

কোনও ফুলে ফলে বাড়ন্ত গাছে ঘুণ ধরলে যেমন তা ভেতর ভেতর ফোঁপরা হয়ে যায়, তেমনি কালো টাকাও দেশের অর্থব্যবস্থার ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

এই পাপকে বাড়তে দেবেন না। এর জন্য সব কিছু নষ্ট হবে। এরই জন্য দরদাম বশে আসছে না।

কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিধি এবং চোরা চালান রোধ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সরবহার সংক্রান্ত বিধি কঠোর ভাবে বলবৎ করা হবে।

এতে সমাজের উপকার হবে অর্থব্যবস্থা সুস্থ হবে

নতুন ২০ দফা কর্মসূচী

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন ঃ

শ্রী ডি এল ঘোষাল
এ্যাসিস্টেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০৭৩

নাম _____
ঠিকানা _____
_____ পিন _____

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন

dayo82/284

আই-কিউ পরীক্ষা

দেবাশিস কর

1. প্রথম ছবিতে তৃতীয় ছকটিতে ? চিহ্নিত স্থানে কোন্ মৌল বসবে ?

2. দ্বিতীয় ছবিতে পাঁচটা দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে দশটা ত্রিভুজ বানাতে পারো ?

3. নিচের ভাগ অঙ্কের প্রত্যেক ইংরেজি অক্ষর এক একটি সংখ্যা বোঝায়। কোন্‌টি কোন্ সংখ্যা বোঝায় বল।

```
MAN) NEON (MO
     MAN
     ----
      AMN
      CAT
      ---
       AT
```


ছবি—১

ছবি—২

সমাধান ও ব্যাখ্যা

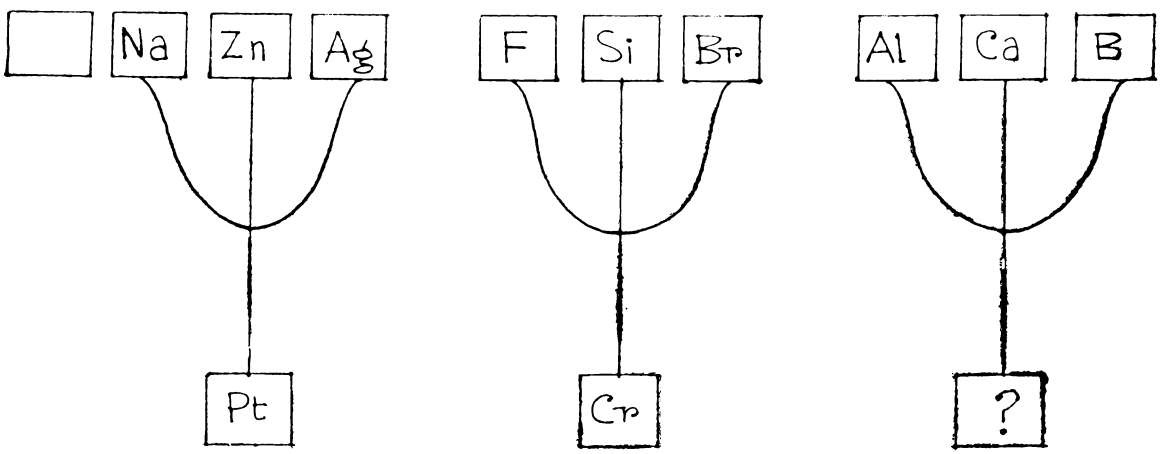

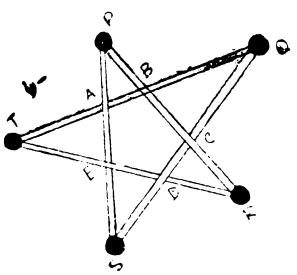

1. উপরের মৌল তিনটির যোজ্যতাগুলির সমষ্টি নিচের মৌলটির যোজ্যতার সমান। সুতরাং তৃতীয় ছকে ? চিহ্নিত স্থানে মৌলটির যোজ্যতা হবে $3+2+3=8$ একটি অষ্টযোজী মৌল—অসমিয়াম (Os)।

2. PS, SQ, QT, TR, RP দেশলাইয়ের কাঠিগুলি △PAB, △QBC, △RCD, △SED, △TEA এবং △ASQ, △BTR, △CPS, △QDT, △EPR উৎপন্ন করেছে।

3. A = 5, C = 4, E = 0, M = 1, N = 2, O = 3, T = 6, বিষয়টা খুবই সোজা, কিন্তু বোঝানো মুশকিল। তবুও ভালভাবে লক্ষ্য কর, প্রথমবারে MAN × M + AM = NEO হচ্ছে। কারণ কোন সংখ্যাকে 1 দিয়ে গুণ করলে সেই সংখ্যাটিই হয়। অতএব M = 1. আরো দেখো এক্ষেত্রে ভাগশেষ হয়েছে দু অঙ্কের। কিন্তু N = M হওয়ায় হাতে নিশ্চয় 1 ছিল [বলা বাহুল্য বিয়োগের ক্ষেত্রে হাতে 1 ছাড়া অন্য কিছু থাকে না]। অতএব N = M + 1 = 2. আবার O থেকে N বাদ দিয়ে যখন M পাওয়া গিয়েছিল, তখন হাতে কিছু থাকার কোন প্রশ্ন ছিল না। স্পষ্টতঃ O—N = M, অতএব O = 3. তাহলে M, N ও O এর মান পাওয়া গেল। এবার এসো পরের ধাপে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে MAN × O + AT = AMN হচ্ছে।

∴ T = O [কারণ তা হলে N—T = N হত], ∴ T > N. সুতরাং N কে 12 ধরলে হয় 12—T = T. ∴ T = 6. হাতে 1 থাকায় M থেকে (A + 1) বাদ দিলে A পাওয়া যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও হাতে নিশ্চয় 1 থাকবে, যা Cএর সঙ্গে যুক্ত হয়ে A এর সমান হয়ে যাবে। ∴ Mকে 11 ধরলে 11—A—1 = A বা A = 5. তা হলে A—(C + 1) = 0 ∴C = 4.

ফের ফিরে এসো মূল ভাজ্যে। O—N = M, হাতে কিছু থাকছে না। ∴E—A = A. এক্ষেত্রে Eকে 10 ধরা হয়েছিল। স্পষ্টতঃ হাতে 1 ছিল যা Mএর সঙ্গে যোগ হয়ে Nএর সমান হয়ে গিয়েছিল। ∴ E = O। সব কটা ইংরেজি অক্ষরের মানই এবার পাওয়া গেল। আশা করি বুঝতে পেরেছ।

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

শ্রীবেন বল

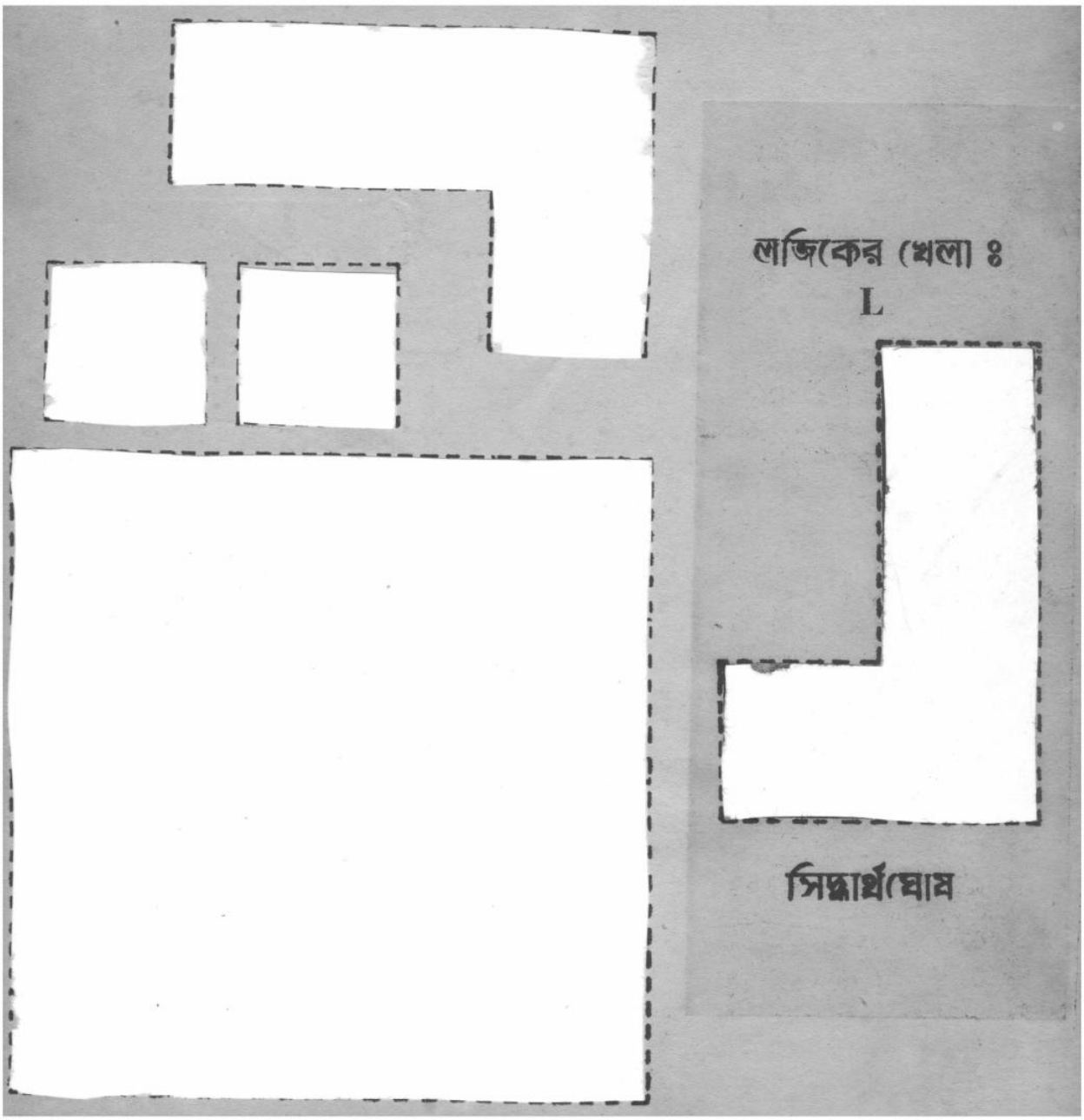
লজিকের খেলা ঃ
L
সিদ্ধার্থঘোষ

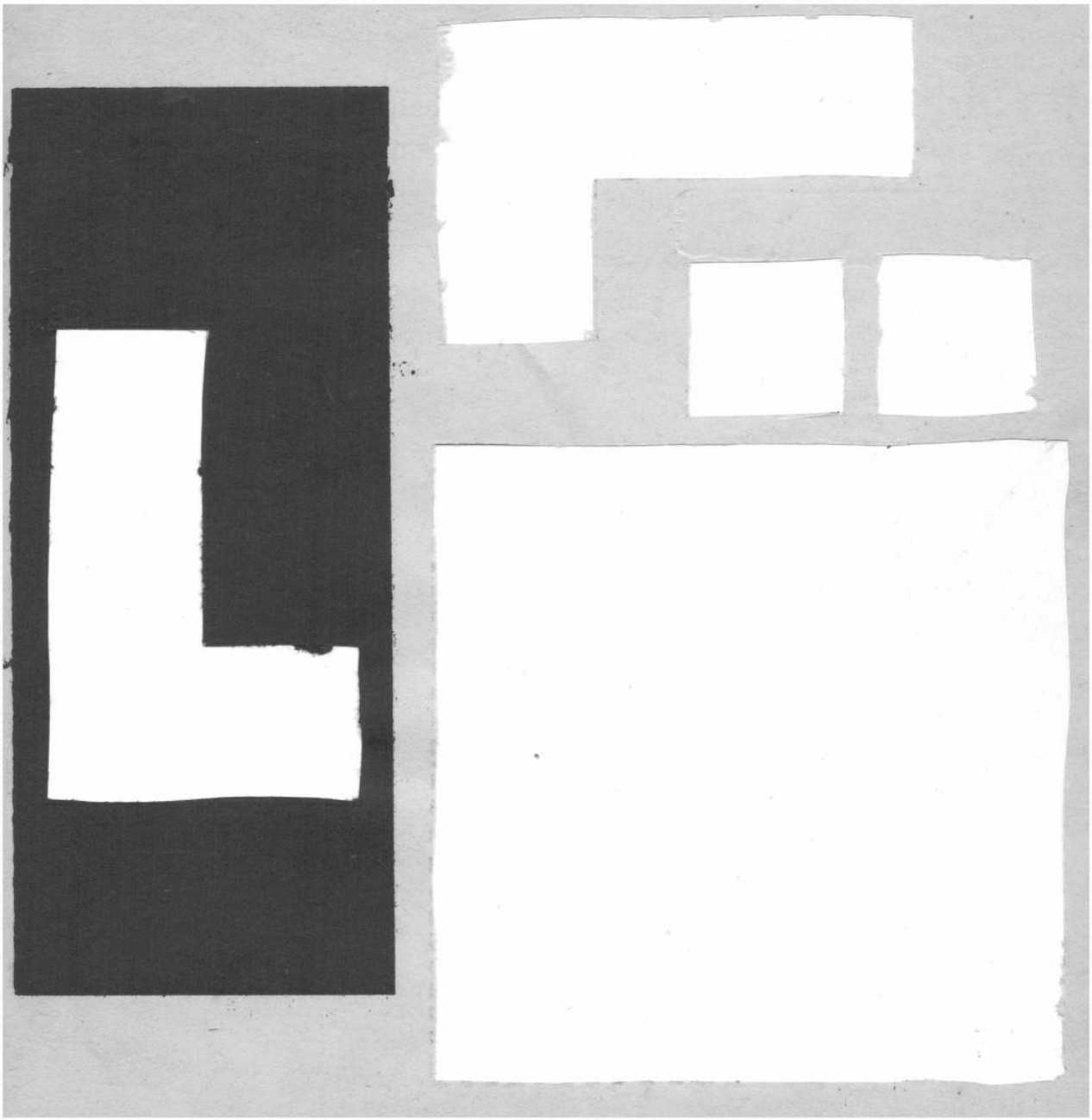

এখানকার উদ্ভিদের প্রকৃতি বেশ বিচিত্র। সব উদ্ভিদেরই লতা বা শাখা কেমন সোজা ভাবে বেড়ে উঠেছে।

একটা পরিষ্কার অঞ্চল দেখে চারজনেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন

একী! মোপটার ভিতর থেকে কিছু একটা আমাদের দেখছে!

ক্যাপ্টেন নিমো অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ছুটে গেলেন। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত হানলেন সেই জীবটার উপর।

আমুদ্রিক ব্লাকড্রমা!

এবার এক ঢালু উপত্যকা দিয়ে ওঁরা নামতে লাগলেন। সমুদ্র এখানে বেশ গভীর। সকলেই তাই বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বালিয়ে দিলেন।

একটা বিশাল গ্রানিট পাথরের পাহাড় ওঁদের সামনে। নিমো এবার থামলেন। এখান থেকেই খাড়া উঠে গেছে ক্রেম্পো দ্বীপ।

শুরু হল ফেরার পালা। হঠাৎ নিমো বন্দুক তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন।

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
তেপান্তর ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ১৫-০০
অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
অপরূপ রূপকথা ১০-০০

পশুপাখী-বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
বনেজঙ্গলে ১৫-০০
পশুপক্ষী ১৫-০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ১০-০০

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন
বাঘের গর্জন ১৫-০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমনির ছড়া ১০-০০
রাঙা ছবি ৩-৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়
হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ১৫-০০
চারমূর্তি ৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
আলো আরও আলো ১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫-০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মেঘনাদ ৮-০০ লুপ্তধন ৮-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বাঙলার ডাকাত
চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০
মহিম ডাকাত ১০-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কায়াহীনের কবলে ৪-০০
হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ •